ব্যায়ামে বাঙালী

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'

'বীরত্বে বাঙালী', 'বিজ্ঞানে বাঙালী', 'বাংলার ঋষি', 'বাংলার মনীষী'
'বাংলার বিদুষী', 'বেনীরাম' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্. এ.-প্রণীত

ষষ্ঠ সংস্করণ—পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার • বাংলাবাজার
কলিকাতা ঢাকা

 মূল্য

অনেক দোষ-ত্রুটি এই বইতে অবশ্যই আছে। আমি যে-কয়টি জীবনী লিখিয়াছি, তাহাদের দ্বারাই বাঙ্‌লাদেশের ব্যায়াম-বীরগণ নিঃশেষিত হন না। ইহারা ব্যতীত বাঙ্‌লাদেশে জীবিত ও মৃত, হিন্দু ও মুসলমান, আরো অনেক ব্যায়াম-বীর আছেন। তাঁহাদের জীবনী যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানাইলে সাগ্রহে ও সানন্দে গ্রহণ করিব ও পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশ করিব।

শ্রীমন্ মহাবীর কুস্তিগীরদিগের ইষ্ট দেবতা। তাঁহারই বীর্যপ্রদ পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া বাঙালী-জীবনে তাঁহার মঙ্গল আশিস্ মাগিতেছি। অয়ং আরম্ভ শুভায় ভবতু।

নিবেদক

বর্ষা, ১৩৩৪ সাল শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ব্যায়ামে বাঙালী' এত শীঘ্র আবার ছাপিতে হইতেছে দেখিয়া মনে হয় বুঝি বাঙালীর সুমতি ফিরিয়াছে। বাঙালীর জীবন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে ভরপুর হউক, হৃদয়ে এই আশা লইয়াই বইখানা লিখিয়াছিলাম। আজ আমার আনন্দ এই, দেশের গুটিকয়েক ছেলেও শরীর সাধনায় প্রকৃত সাধকের মত আত্মনিবেশ করিয়াছেন। বাঙালীর শরীর-সাধনায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যদি কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারে, তাহাতেই আমার শ্রমের চরম সার্থকতা।

এই সংস্করণে বইখানায় কিছু কিছু নূতন বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। তরুণ বাঙ্‌লার শারীর সম্পদ' বাঙ্‌লার তরুণ-জীবনে আশা ও উৎসাহ দিতে পারিবে, আশা করি।

চৈত্র, ১৩৩৫ শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

চতুর্থ সংস্করণ

'ব্যায়ামে বাঙালী'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল। দেশবাসীর সহৃদয় সহানুভূতি আমার এই প্রয়াসে ইন্ধন যুগিয়েছে। বাঙালী ছেলেমেয়েরা ব্যায়াম-চর্চা ক'রে বলিষ্ঠ দেহ ও কর্মিষ্ঠ জীবন লাভ করে, এই উদ্দেশ্যেই বইখানি লিখেছিলাম। আজকের সংকটময় দিনে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে, নইলে বাঁচবার উপায় নেই। আমার এ বইখানি সংগ্রামশীল জীবনের সাথী হোক্, এই কামনা।

এই সংস্করণে বইখানিকে নানাদিক্ দিয়ে সমৃদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছি।

কলিকাতা, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট্ — শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

১৯৩৯

ষষ্ঠ সংস্করণ

ব্যায়ামে বাঙালীর নূতন সংস্করণ অনেক দিন পরে প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে আরো কয়েকজন তরুণ ব্যায়ামবীরের জীবনী ও চিত্র সন্নিবেশিত হইল। সময়াভাবে আরো অনেকের জীবনী দিতে পারিলাম না। যাঁহারা জীবনী দিতে চান তাঁহারা জীবনী ও ফটো আমার প্রকাশালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। অনেকের সম্বন্ধে বিস্তৃত বা আধুনিক তথ্য দিতে পারি নাই, পাইলে তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিব। পরিশিষ্টে সরল ব্যায়াম-প্রণালী স্থলে 'সহজ ব্যায়াম ও যোগ ব্যায়াম' নামক নূতন একটি অধ্যায় শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় এম. এ. মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন। আশা করি, এই প্রয়োজনীয় অধ্যায়টি ব্যায়াম-শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারে আসিবে।

১২।৬।৫৩ ইং — শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

সহজ ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়াম

বুকডন

[এই অধ্যায়টি আয়রনম্যান শ্রীনীরদ কুমার সরকার-প্রণীত 'শরীর ও শক্তি' এবং 'সরল যোগ-ব্যায়াম' নামক বই অবলম্বনে পুনর্লিখিত।]

১। ১নং (ক) চিত্রের ভঙ্গীতে নিজ বুকের প্রশস্ততা অনুযায়ী অথবা এক হাত ফাঁক করিয়া দুই হাত মাটিতে রাখ ; হাতের আঙুলগুলি ছড়াইয়া দাও। দুই পা জোড়া অথবা ১০।১২ ইঞ্চি ফাঁক রাখ। এখন, শ্বাস লইতে লইতে ১নং (ক) চিত্রের ভঙ্গি হইতে পা ও হাতের উপর ভর করিয়া শরীর সমুখ দিকে আগাইয়া দাও এবং ১নং (খ) চিত্রের মত শরীর নীচে নামাও। কনুই দুটি যেন দুই পাশের পাঁজরে ঘসিয়া যায় এবং বুক, কোমর ও উরু যেন মাটিতে না লাগে। মুখ তুলিয়া সামনে তাকাও। এখন, ১নং (গ) চিত্রের ভঙ্গীতে কোমর নীচে রাখিয়া বুক ঠেলিয়া যত উপরে পার তোল ও হাত সোজা কর।
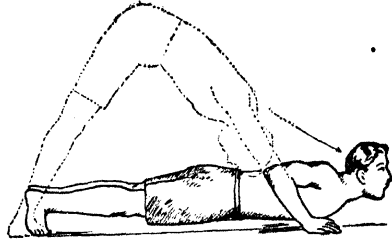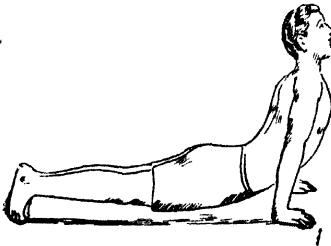
১নং (ক) চিত্র ও ১নং (খ) চিত্র

১নং (গ) চিত্র

এই সময় হাঁটু যেন না ভাঙ্গে এবং পা যেন সোজা থাকে ও স্থানচ্যুত না হয়। ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে দ্রুত ১নং (ক) চিত্রের ভঙ্গীতে ফিরিয়া যাও। পুনরায় (খ) ও (গ) চিত্রের মত ভঙ্গী কর। সাধ্যমত যতবার পার এইরূপ কর। কিন্তু পা জোড়া করিয়া বুকডন করিবার সময় পা সোজা থাকিবে। শরীর যখন পিছন দিকে যাইবে তখন গোড়ালি মাটিতে লাগিবে; শরীর আগাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালি মাটি হইতে উঠিবে। শরীর যখন (খ) ও (গ) চিত্রের ভঙ্গীতে থাকিবে তখন পায়ের আগার (টো) উপর ভর থাকিবে।

এই বুকডনে হাত, কাঁধ, বুক, পিঠ, কোমর প্রভৃতি পেশীর বিশেষ কাজ করে এবং ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ ও পাকস্থলীর কাযকরী ক্ষমতা বাড়ায়।

২। ২নং (ক) চিত্রের মত যার যার বুকের প্রশস্ততা অনুযায়ী অথবা এক হাত ফাঁক করিয়া দুই হাত মাটীতে স্থাপন কর এবং জোড়া অথবা ১০।১২ ইঞ্চি ফাঁক করিয়া দুই পা মাটীতে রাখ। শরীরটী সোজা থাকিবে। এখন, ধীরে ধীরে হাতের ও পায়ের আগার উপর ভর করিয়া (খ) চিত্রের ভঙ্গিতে শরীর
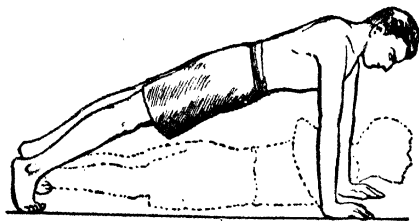
২নং (ক) ও (খ) চিত্র

নীচে নামাও। মুখ তুলিয়া সাম্‌নে তাকাও। এবার ধীরে ধীরে শরীর তুলিয়া ২নং (ক) চিত্রের মত হও। আবার শরীর নামাও; সাধ্যমত যতবার পার এইরূপ কর। শরীর যখন নীচে নামিতে থাকিবে তখন হাতের কনুই দুটি দুই পাশের পাঁজরে ঘসিয়া যাইবে। আর, শরীর নীচে নামিলে বুক, চোয়াল

কোমর, উরু মাটিতে না লাগিয়া একটু উপরে থাকিবে। উঠা-নামা করিবার সময় শরীর সোজা থাকিবে। এই বুকডনে বিশেষ করিয়া হাত, বুক ও পিঠের কাজ ভাল হয়।

শ্বাস :—শরীর নীচে নামিবার সময় শ্বাস গ্রহণ এবং উপরে উঠিবার সময় শ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে।

বৈঠক
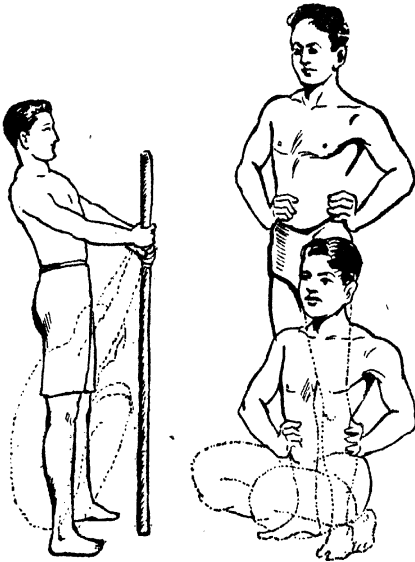
৩নং (ক) চিত্র ৩নং (খ) চিত্র

৬। কোমরে হাত না দিয়া দুই হাতে লাঠি ধরিয়া ৩নং (ক) চিত্রের

ভঙ্গিতে সোজা ব'স ও দাঁড়াও। গোড়ালি না তুলিয়া অথবা তুলিয়া দুই ভাবেই বৈঠক করা যাইতে পারে। শরীর যেন সোজা থাকে।

এবার কোমরে হাত দিয়া ছোট লাফে সামান্য আগাইয়া গিয়া পায়ের আগায় ভর করিয়া সোজা ব'স। আবার ছোট লাফ দিয়া সামান্য পিছনে পূর্ব স্থানে আসিয়া দাঁড়াও। ৩ (খ) চিত্র দেখ।

কোমরে হাত দিয়া বা লাঠি ধরিয়া দুই প্রকারেই বৈঠক করা যাইতে পারে; বেশী করিতে হইলে লাঠি ধরিয়া করাই ভাল। মাঝে মাঝে বিরাম দিয়া সংখ্যায় যত বেশী করা যায় ততই ভাল। কিছুদিন এইভাবে বৈঠক করিয়া পায়ের সামর্থ্য একটু বাড়িলে কোমরে হাত দিয়া লাফান বৈঠক করা যায়। এই বৈঠকে পায়ের কাজ ভাল হয়।

শ্বাস :—বৈঠকে বসিবার সময় শ্বাস ত্যাগ ও দাঁড়াইবার সময় শ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে।

খালি হাতে ব্যায়াম এবং আসন

৪। ৪নং চিত্রের ভঙ্গিতে গোড়ালি জোড়া অথবা সামান্য ফাঁক করিয়া দাঁড়াও। দুই হাত সোজা মাথার উপরে তোল। ধীরে ধীরে শরীর সমুখের দিকে বাঁকাও এবং হাত দিয়া মাটি অথবা পা স্পর্শ কর; হাঁটু যেন না ভাঙে। পূর্ববৎ সোজা হও। বার বার এইরূপ কর। শরীর বাঁকা বা সোজা করিবার সময়া মাথা যেন দুই বাহুর মাঝে থাকে এবং মাথা ও হাত যেন এক সঙ্গেই নামা-উঠা করে।

শ্বাস :—শরীর নামাইবার সময় শ্বাস ত্যাগ আর সোজা করিবার সময় শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। শ্বাস দীর্ঘভাবে ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে হইবে।

এই ব্যায়ামে মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড়া ও শরীর বেশ নমনীয় থাকে; পাঁজরের হাড়, বুক-পিঠের শিরা-উপশিরা, পাকস্থলী ও ফুসফুসের কাজ ভাল হয়। এই ব্যায়ামটী যে-কোন বয়সের মেয়ে-পুরুষেই করিতে পারে।

৫। ৫নং চিত্রের ভঙ্গীতে কোমরে হাত দিয়া পা জোড়া করিয়া সটান হইয়া দাঁড়াও। এখন, পা হইতে কোমর পর্যন্ত সোজা রাখিয়া ঊর্দ্ধাঙ্গ
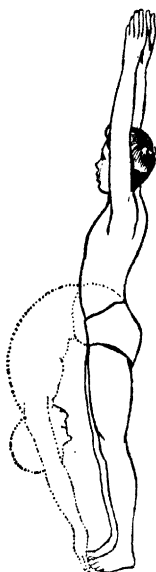
৪নং চিত্র ৫নং চিত্র

একবার সমুখ দিকে নোয়াইয়া ফের সোজা কর। এবার পিছন দিকে বাঁকাও ও সোজা কর। ৫—১০ বার এইরূপ কর; অথবা সাধ্যমত যতবার পার কর।

শ্বাস :—শরীর সমুখে নোয়াইবার সময় শ্বাস ত্যাগ এবং সোজা করিবার সময় শ্বাস গ্রহণ করিবে। তারপর শ্বাস বন্ধ করিয়া শরীর পিছনে বাঁকাইবে ও সোজা করিবে। সমুখ দিকে বাঁকাইতে বাঁকাইতে শ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে।

এই ব্যায়ামে কোমর, পিঠ ও বুকের পেশীকে কর্মক্ষম করে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের বেষ্টনীর হাড় বাড়ায়, কোমরের মেদ কমায় ও শিড়দাঁড়া নমনীয় করে। ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। সাধারণতঃ এই ব্যায়ামটি মেয়ে-পুরুষ সকলেই অভ্যাস করিতে পারে। অভ্যাস না থাকিলে বৃদ্ধদের পক্ষে এই ব্যায়ামটি করা কষ্টকর। সাধ্যাতীত বা কষ্টকর হইলে বৃদ্ধদের এ ব্যায়াম না করাই ভাল।

৬। ৬ নং চিত্রের ভঙ্গীতে কোমরে হাত দিয়া পা-দুটি সামান্য ফাঁক অথবা গোড়ালি জোড়া করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। পা হইতে কোমর পর্যন্ত ঠিক রাখিয়া ঊর্ধ্বাঙ্গ একবার বাম দিকে যতটা পার মোচড় দাও (ঘুরাও) ও সোজা কর; আবার ডান দিকে যতটুকু পার মোচড় দাও ও সোজা কর।

শ্বাস :—শরীর ঘুরাইবার সময় শ্বাস গ্রহণ ও সোজা করিবার সময় শ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। সংখ্যা—১০ হইতে ২০ বার।

এই ব্যায়ামে কোমরের মেদ কমে; মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড়া নরম ও সতেজ থাকে। ছোট বড় মেয়ে পুরুষ সকলেই এই ভন করিতে পারে।

৬নং চিত্র

৭। ৭নং চিত্রের মত পায়ের গোড়ালি দুটি একত্র করিয়া সটান হইয়া দাঁড়াও। দুই হাত দুই পাশে তোল ও চিত করিয়া সাধ্যমত জোর দিয়া মুষ্টিবদ্ধ কর। এখন, জোর দিয়া ধীরে ধীরে দুই কনুই ভাঙ্গিয়া হাতের মুঠি কাঁধের কাছে আন ও জোর দিয়া দুই হাত দুই দিকে মেলিয়া দাও। ব্যায়ামটী অন্য প্রকারেও করা যাইতে পারে।

এক হাতের মুষ্টি যখন কাঁধের উপরে আসিবে তখন অন্য হাত সটান মেলিয়া দিবে। যখন এক হাত মেলিয়া অন্য হাতের মুষ্টি কাঁধের কাছে আনিবে তখন
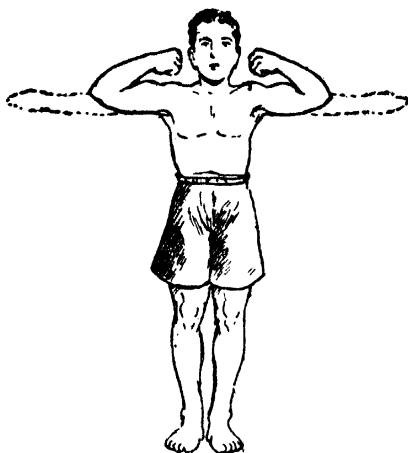
৭নং চিত্র

কাঁধের নিকটস্থ হাতের দিকে মুখ ঘুরাইয়া তাকাইবে। আর, যখন দুই মুষ্টি একই সঙ্গে কাঁধের নিকট আসিবে তখন দৃষ্টি সম্মুখে থাকিবে। এই ব্যায়ামটী হাতের উপর সাধ্যমত জোর দিয়া করিতে হয়। ব্যায়ামটি দুই প্রকারেই করা উচিত।

সংখ্যা :—১০ হইতে ১৫ বার।

শ্বাস :—দুই কনুই ভাঙ্গিয়া মুষ্টি কাঁধের কাছে আনিতে আনিতে শ্বাস গ্রহণ আর দুই হাত সটান মেলিবার সময় শ্বাস ত্যাগ করিবে। আবার দ্বিতীয় নিয়মে, যখন এক হাত ভাঙ্গিয়া এবং অপর হাত সোজা রাখিয়া এই ডন করিবে তখন শ্বাস স্বাভাবিক থাকিবে।

এই ব্যায়ামটীতে হাতের পেশীর কাজ খুব ভাল হয়। ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-মেয়ে সকলেই এ ব্যায়াম করিতে পারে। তবে মেয়েদের হাত ভাঙ্গিবার সময় বেশী জোর না দেওয়াই উচিত। সাধ্যমত জোর দিয়া এই ব্যায়াম করিলে হাতের পেশী যেমন পুষ্ট তেমনি শক্ত হয়। তাই মেয়েদের পক্ষে জোর না দিয়া করাই ভাল; জোর দিয়া করিলে তাহাদের হাতের নমনীয়তা নষ্ট হইতে পারে।

৮। ৮নং চিত্রের ভঙ্গীতে পা জোড়া ও লম্বা করিয়া সটান চিত হইয়া শুইয়া পড়। দুই হাত মাথার দিকে লম্বাভাবে মাটীতে রাখ। এখন কোমর হইতে ঊর্দ্ধাঙ্গ ধীরে ধীরে তুলিয়া হাত দিয়া পা স্পর্শ কর, আবার শুইয়া পড়। উঠিবার সময় হাত ও মাথা যেন একত্রে উঠে এবং ঊর্দ্ধাঙ্গ তুলিবার সময় পা যেন মাটীতে লাগিয়া থাকে। প্রথম প্রথম পা মাটী হইতে উঠিতে পারে; তাহাতে দোষ নাই। তবে পা যাহাতে মাটী হইতে না উঠে তার জন্য
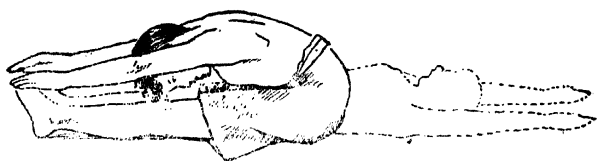
৮নং চিত্র

কেহ পা চাপিয়া ধরিলে ভাল হয়। একটি বেঞ্চের উপর শুইয়া তাহার এক পাশে একটি রশি বা ফিতা একটু আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া তাহাতে পা (পায়ের পাতা বা পায়ের সংযোগ-স্থল) আটকাইরা ব্যায়াম করিলেও চলে।

সংখ্যা :—৫ হইতে ১৫ বার।

শ্বাস :—শরীর সমুখ দিকে বাঁকাইবার সময় শ্বাস ত্যাগ, আবার বসিয়া চিত হইয়া শুইতে শুইতে শ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। শ্বাস ধীরে ধীরে টানিতে

ও ত্যাগ করিতে হইবে। একেবারে শুইয়া পড়িবার আগেই শ্বাস গ্রহণ শেষ হইয়া গেলে শ্বাস বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িবে এবং শ্বাস বন্ধ রাখিয়াই উঠিতে থাকিবে। উর্ধ্বাঙ্গ কিছু উঠিলে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে হাত দিয়া পায়ের আঙুল ধরিবে; বাকী শ্বাসটুকু পায়ের আঙুল ধরিয়া নিঃশেষে ছাড়িয়া দিবে।

এই ব্যায়ামে শিরদাঁড়া নমনীয় রাখে, যকৃতের দোষ দূর করে ও পেটের মেদ কমায়।

খালি হাতে ব্যায়াম ও আসন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

যন্ত্র সাহায্যে ব্যায়াম ও যন্ত্র ছাড়া বুকডন বৈঠক প্রভৃতি করিলে খুব দ্রুত ফল হয়; কিন্তু সে ফল স্থায়ী হয় না। খালি হাতে ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়ামে দ্রুত ফল না হইলেও স্থায়ী ফল পাওয়া যায়। বুকডন, বৈঠক প্রভৃতি অন্য ব্যায়ামের সঙ্গে খালি হাতে ব্যায়াম ও যৌগিক আসন করিলে শরীর নমনীয়, কর্মক্ষম ও সুগঠিত হয়। অন্য কোন ব্যায়াম না করিয়া এগুলির মধ্য হইতে যে কোন ৫।৬টী ব্যায়াম করিলেও চলিতে পারে। যে গুটিকয়েকটি আসন ও সহজ ব্যায়ামের পরিচয় এখানে দেওয়া হইল, শুধু সেই কয়টি আসন-ব্যায়াম করিলেই স্বাস্থ্য ভাল হইয়া মোটামুটি শরীর গঠিত হইতে পারে। প্রত্যেকটি আসন এক সঙ্গে ৩ বার অভ্যাস করিতে হইবে এবং প্রতি আসনের পর শবাসন (পৃঃ ২৪) করা বিধেয়। গৃহীরা কোন আসনই একটানা ৩ মিনিটের বেশি করিবেন না।

সকালে স্নানের পূর্বে বা সন্ধ্যায় যে কোন সময় খালি হাতে ব্যায়াম ও আসন করা চলে। তবে আসনের পূর্বে সামান্য সহজ ব্যায়াম, বিশেষতঃ ৪ ও ৫ নম্বরের ব্যায়াম দু'টি করিয়া লইলে ভাল হয়। তারপর পবন-মুক্তাসন (পৃঃ ১০) করিয়া অন্যান্য যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। আসনের সময় শ্বাস যেন স্বাভাবিক থাকে। শ্বাস বন্ধ করা নিষিদ্ধ।

মানুষের দেহ ও মনের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ। বিশেষতঃ তাহার দেহ ও মনের মধ্যে মনই প্রধান। তাই শুধু দেহচর্চাদ্বারা তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রক্ষা হইতে পারে না। ঐ সঙ্গে মানসিক সবলতা অর্জন ও মানসিক স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। যোগ-ব্যায়াম দ্বারা এই উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

কতকগুলি যৌগিক আসন বিশেষভাবে মানসিক স্বাস্থ্য অর্জনে সহায়তা করে। যেমন, পদ্মাসন, বজ্রাসন ইত্যাদি। আর কতকগুলি যোগ-ব্যায়াম দ্বারা সাধারণ ভাবে দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। যেমন, সর্বাঙ্গাসন, ধনুরাসন ইত্যাদি।

এখানে পবন-মুক্তাসনের পরে মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়ক আসনগুলি এবং তৎপর দৈহিক যোগ-ব্যায়ামগুলি দেওয়া হইল। যোগাসন সংখ্যায় অনেক। স্বাস্থ্যানুরোধে ইহার সবগুলি অভ্যাস না করিলেও চলে। আর, কাহারো পক্ষে সবগুলি আয়ত্ত ও অভ্যাস করাও সম্ভব নয়। কাজেই সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে যে আসনগুলির অভ্যাস অবশ্য করণীয়, সেইগুলিই যথাক্রমে দেওয়া হইল।

১। পবন মুক্তাসন

৯নং চিত্রের ভঙ্গিতে সটান চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। তারপর ডান হাঁটু ভাঙিয়া চিত্রের ভঙ্গিতে দুই হাতে জড়াইয়া পেট ও বুকের উপর চাপিয়া ধর।

৯নং চিত্র

এইভাবে ১০ সেঃ থাক। তারপর ডান হাঁটু ছাড়িয়া বাম হাঁটু চাপিয়া

১০ সেকেণ্ড থাক। হাঁটু বদলাইয়া তিনবার করিয়া এই আসনটি কর। তারপর ২০ সেঃ শবাসন কর।

এখন, একত্রে দুই হাঁটু ভাঙিয়া আসনটি অভ্যাস কর। ১০ সেঃ ঐ ভাবে থাকিবার পর হাত ছাড়িয়া পা মেলিয়া দাও। এইরূপে ৩ বার আসনটি কর। ২০ সেঃ শবাসন থাক।

শ্বাস স্বাভাবিকভাবে চলিতে থাকিবে। অথবা শ্বাস একেবারে ছাড়িয়া দিয়া হাঁটু ভাঙিবে এবং যতক্ষণ হাঁটু চাপিয়া থাকিবে, ততক্ষণ আর শ্বাস লইবে না। তারপর হাঁটু ছাড়িয়া দিয়া পা মেলিতে মেলিতে শ্বাস লইবে।
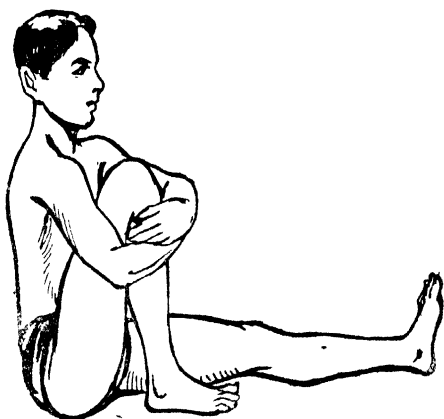
৯ (ক) নং চিত্র

এই আসনে পেটের বায়ু দূর করে এবং নিয়মিত অভ্যাস করিলে কদাচ পেটে বায়ু জমে।

আসনটি করিবার বিশেষ নিয়ম এই যে আগে ডান পা ও পরে বাম পা ভাঙিয়া ইহা অভ্যাস করিতে হয়।

বসিয়াও এই আসনটি অভ্যাস করা যায়। ৯ (ক) চিত্র দেখ।

২। পদ্মাসন

সোজা হইয়া পা সাম্‌নে রাখিয়া ব'স। বাম হাঁটু ভাঙ্গিয়া বাম পায়ের পাতা ডান উরুর উপরে রাখ। তারপর ডান হাঁটু ভাঙ্গিয়া ডান পায়ের পাতা বাম উরুর উপরে রাখ। এইরূপে ডান উরুর উপর বাম পায়ের পাতা ও বাম উরুর উপর ডান পায়ের পাতা পাশাপাশি রাখিয়া সোজা হইয়া বসিবার ভঙ্গিকে পদ্মাসন বলে। দুই হাতের চেটো হাঁটুর কাছাকাছি উরুতে রাখিয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ থাক। ১০নং চিত্র দেখ। তারপর অন্ততঃ ১ মিনিট শবাসনে থাক। শ্বাস স্বাভাবিক। বেশি সময় পদ্মাসনে বসিতে হইলে পা বদলাইয়া লওয়া চলে। ধ্যান-ধারণায় এই আসনটি প্রশস্ত।
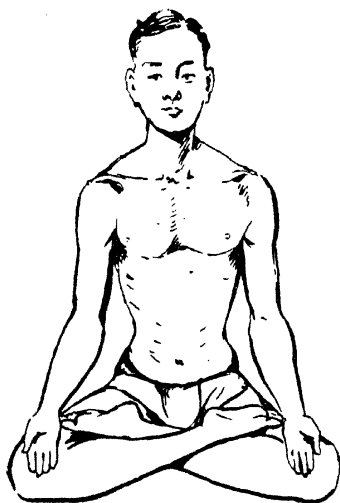
১০নং চিত্র

পদ্মাসনে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকা অভ্যাস করিলে বাতাদি রোগ দূর হয় এবং একটানা বেশিক্ষণ থাকিলে উপকার ছাড়া অপকার হয় না।

৩। বজ্রাসন

১১নং চিত্রের ভঙ্গিতে হাঁটু ভাঙ্গিয়া গোড়ালি পরস্পর সমান্তরাল রাখিয়া পায়ের পাতা মুড়িয়া গোড়ালির উপর ব'স। পায়ের পাতা পিছন দিকে লম্বাভাবে থাকিবে (আঙ্গুলগুলি মাটিতে থাকিবে) এবং গোড়ালি গুহ্যদ্বারের দুই পাশে রাখিয়া বসিতে হইবে। এইভাবে কয়েক মিনিট বসিয়াই চট করিয়া শবাসন করিবে। শ্বাস স্বাভাবিক। সকাল সন্ধ্যা এই আসনে বসিয়া ধ্যান ধারণা করা চলে।

১১নং চিত্র

আহারের পর এই আসনে ৫ মিনিট বসিলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে চিরুণীদ্বারা মাথা আঁচড়াইলে সহসা চুল পাকে না। এই আসনে পায়ের শক্তি বাড়ে ও পেশী দৃঢ় হয়। ইহাতে পায়ের বাত নষ্ট করে, সায়াটীকার ব্যথা দূর হয় এবং ব্যথা হইতে পারে না। কোনো আসনই একটানা ৩ মিনিটের বেশী গৃহীদের করিতে নাই, কিন্তু এ আসনটী বেশী করিলেও ক্ষতি নাই। তবে অল্প সময়ই হউক আর বেশি সময়ই হউক, এই আসন করার পরই অন্ততঃ ১ মিনিট শবাসন থাকিতে হইবে।
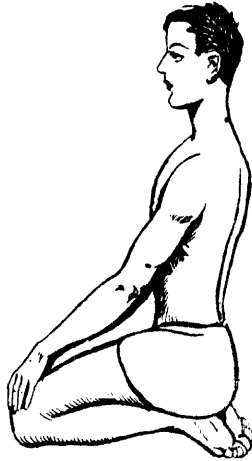
৪। গোমুখাসন

পা সম্মুখ দিকে লম্বা করিয়া সোজা হইয়া ব'স। বাম হাঁটু ভাঙ্গিয়া ডান পায়ের তলা দিয়া আনিয়া বাম গোড়ালি দক্ষিণ নিতম্বে ঠেকাও।

তারপর ডান হাঁটু ভাঙ্গিয়া বাম হাঁটুর উপর রাখ এবং ডান গোড়ালি দিয়া বাম নিতম্ব স্পর্শ কর। (গোড়ালির উপর যেন বসা না হয়)। এখন ডান বাহু তুলিয়া কনুই ভাঙ্গিয়া হাত পিছনে নামাও ও বাম বাহু নীচে রাখিয়া কনুই ভাঙ্গিয়া বাম হাত পিছনে ঘুরাইয়া উপরে তোল। দুই হাতের আঙ্গুল বাঁকাইয়া হুকের মত ধর। ১২নং চিত্র দেখ। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া হাত ছাড়িয়া দাও। তারপর পা বদলাইয়া নীচের পা উপরে, আর উপরের পা নীচে দিয়া হাঁটুর উপরে হাঁটু রাখ। সঙ্গে সঙ্গে হাত বদলাইয়া উপরের বাহু নীচে ও নীচের বাহু উপরে রাখিয়া কনুই ভাঙিয়া পিঠের-দিকে আঙ্গুলে আঙ্গুলে হুকের মত ধর। পা ও হাত বদল

১২নং চিত্র

করিয়া পর পর ৩ বার এইরূপ কর। যখন যে পা উপরে থাকিবে তখন সেই বাহু উপরে থাকিবে। যখন যে হাত নীচে থাকিবে সেই হাতের চেটো বাহিরের দিকে থাকিবে, আর যে হাত উপরে থাকিবে সে হাতের চেটো ভিতরে, পিঠের দিকে থাকিবে।

এই আসনে অস্বাভাবিক চর্বি কমাইয়া দেয়; যকৃত ও প্লীহার দোষ দূর করিয়া ক্ষুধা বাড়ায়; স্নায়ুকে সতেজ করে ও কর্মক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়। টন্‌সিলের দোষ দূর করে, মেরুদণ্ডকে সতেজ রাখে। ইন্দ্রগ্রন্থি বা যৌবন-গ্রন্থির প্রয়োজনীয় অন্তর্মুখী রস উৎপন্ন করে। শরীরের রোগ-বীজাণু ধ্বংস করিয়া যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করে। ছোট-বড়, পুরুষ ও মেয়ে সকলেই ইহা করিতে পারে।

এই আসনের ১৩নংএর ভঙ্গিটি আয়ত্তে আসিলে ১৩ (ক)এর ভঙ্গিটি অভ্যাস করিবে। তাহাতে আরও সুফল পাওয়া যায়।

প্রথমে ১৩নং-এর ভঙ্গির মত হও; ঐ অবস্থায় হাঁটু ভাঙ্গিয়া পদ্মাসন কর ও কোমর বাঁকাইয়া হাঁটু দুইটি মাথার কাছে আন। তারপর হাত দুটী ভাঙ্গিয়া হাতের চেটো চিত করিয়া ঘাড়ের নীচে রাখ। কনুই যেন মাটিতে থাকে। যতক্ষণ পার এই অবস্থায় থাক; তারপর ২০।৩০ সেঃ শবাসন করিয়া পুনরায় এই আসন কর।

সংখ্যা :—৩ বার, অথবা একবারে ৩ মিঃ।

শ্বাস :—স্বাভাবিক।

সর্বাঙ্গাসন করার পর মৎস্যাসন করিলে ভাল হয়। সর্বাঙ্গাসন ও মৎস্যাসনে সর্বব্যাধি বিনাশ হয় ও হজম শক্তি বাড়ে।

৬। অর্ধকূর্মাসন

বজ্রাসনের ভঙ্গীতে (১১নং চিত্র) হাঁটু গাড়িয়া পায়ের পাতা মুড়িয়া গোড়ালির উপর ব'স। হাঁটু যেন ফাঁক না থাকে। এখন ধীরে ধীরে সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কপাল ও নাক মাটিতে ঠেকাও। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটি জোড়া করিয়া ও সামনে মেলিয়া হাত ও উর্ধ্বাঙ্গ যতদূর পার সম্মুখ

দিকে আগাইয়া দাও। কিন্তু নিতম্ব গোড়ালির উপর এমন চাপিয়া রাখিবে, যেন গোড়ালি হইতে উপরে না উঠে। ১৪নং চিত্র দেখ।

১৪ নং চিত্র

এই অবস্থায় পেট, বুক ও পাঁজরের দুই পার্শ্ব উরুর উপরে থাকিবে এবং উহাতে বিশেষ চাপ পড়িবে। এইভাবে যতক্ষণ পার থাক, তারপর উঠিয়া সোজা হও। এইরূপ ৩ বার কর ; পরে ১ মিঃ শবাসনে থাক। অভ্যাস হইয়া গেলে একসঙ্গে ৩ মিঃ এই আসনে থাকিয়া ১ মিঃ শবাসন করিবে।

শ্বাস :—স্বাভাবিক।

এই আসনে যকৃতের ও প্লীহার দোষ দূর করিয়া হজমশক্তি বাড়াইয়া দেয়।

৭। পশ্চিমোত্তান আসন

পা দুটি সামনে মেলিয়া জোড়া করিয়া ব'স। তারপর দেহটি ধীরে ধীরে সামনে নোয়াইয়া দুই হাতে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল ধরিয়া কপাল হাঁটুতে

১৫ নং চিত্র

ঠেকাও। এইভাবে ১০ সেঃ থাকিয়া ২০ সেঃ শবাসন কর। এইরূপে তিনবার আসনটি অভ্যাস করিয়া ১ মিনিট কাল শবাসনে থাক। লক্ষ্য রাখিবে, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালি যেন মাটি হইতে উঠিয়া না পড়ে। ১৫নং চিত্র দেখ।

এই আসনে প্লীহা ও যকৃতের দোষ দূর হয়, পেট ও কোমরের মেদ কমে, শিরদাঁড়া নমনীয় থাকে।

এই আসনটি অভ্যাস করিতে পেশী ও শিরায় বিশেষ টান লাগে ও চাপ পড়ে। কাজেই খুব সতর্ক হইয়া আসনটি করা উচিত। প্রথমে কপাল হাঁটুতে না-ও ঠেকিতে পারে। কিন্তু একটু একটু করিয়া ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে ঠেকানো সহজ হইবে। সকালে দেহের জড়তা থাকে বলিয়া বিকালেই ইহা অভ্যাস করা ভাল।

৮। জানুশিরাসন

দুই পা সম্মুখ দিকে লম্বা করিয়া সোজা হইয়া ব'স। ডান হাঁটু ভাঙ্গিয়া গোড়ালি যোনি-মণ্ডলে চাপিয়া পায়ের পাতা বাম উরুতে ঠেকাও।
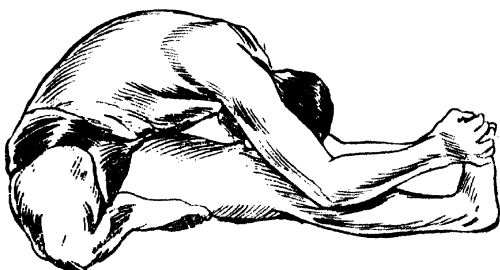
১৬ নং চিত্র

(গুহ্যদ্বার হইতে অণ্ডকোষের নীচে যে স্থানটুকুতে সেলাইয়ের মত চিহ্ন আছে সেই স্থানকে যোনি-মণ্ডল বলে)। এখন আস্তে আস্তে সামনে ঝুঁকিয়া দুই

ভর করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া মাটী হইতে তোল। ঘাড় বাঁকাইয়া মাথার তালু মাটীতে রাখিয়া বুক যতদূর পার উপরে তোল। হাত দিয়া পায়ের আঙুল ধর। চিত্র দেখ।

এই ভাবে সাধ্যমত কিছুক্ষণ থাক, তারপর ২০—৩০ সেকেণ্ড শবাসনে বিশ্রাম করিয়া আবার আসনটি কর। পর পর তিনবার আসনটি কর ও প্রতিবারের শেষে ২০।৩০ সেঃ করিয়া শবাসনে থাক। শবাসন আধ মিনিট হইতে এক মিনিট করিলেই যথেষ্ট। অভ্যাস হইয়া গেলে এক সঙ্গে তিন মিঃ আসনটি করিলেই চলে।

শ্বাস :—স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হইবে।

এই আসনে শ্বাসনালী মোটা করিয়া ফুসফুসের জোর বাড়ায়। বুকের বেষ্টনীর ও পাঁজরের হাড় বাড়াইয়া বুকের খাঁচা বড় করে। যাহাদের বুক কবুতরের বুকের মত তাহারা এই আসন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই উপকার পাইবে। ইহাতে হাঁপানিও আরোগ্য হয়।

১১। অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন

বাম হাঁটু ভাঙিয়া বাম গোড়ালি গুহ্যদ্বারের সাম্‌নে যোনি-মণ্ডলে চাপিয়া ব'স। ডান পা বাম উরুর উপর দিয়া মাটিতে ঠেকাইয়া ডান হাঁটু খাড়া করিয়া বুকের কাছে আন। এখন, বাম বগল-দাবায় ডান হাঁটু আটকাইয়া ডান পায়ের বুড়ো আঙুল বামহাতে মুঠি করিয়া ধর। তারপর শরীরটি ডানদিকে ঘুরাইয়া ডান বাহু পিছনে দিয়া ডান হাতের উল্টো পিঠ কোমরের পাশে বাম উরুতে চাপিয়া রাখ। ১০।১৫ সেঃ এই অবস্থায় থাক। ১৯ নং চিত্র দেখ।

এবার পা বদলাইয়া ডান উরুর উপরে বাম পা আটকাইয়া আসনটি কর। এইরূপে পা বদলাইয়া ৩ বার করিয়া আসনটি অভ্যাস করিবে। তারপর ২০ সেঃ শবাসনে থাকিবে।
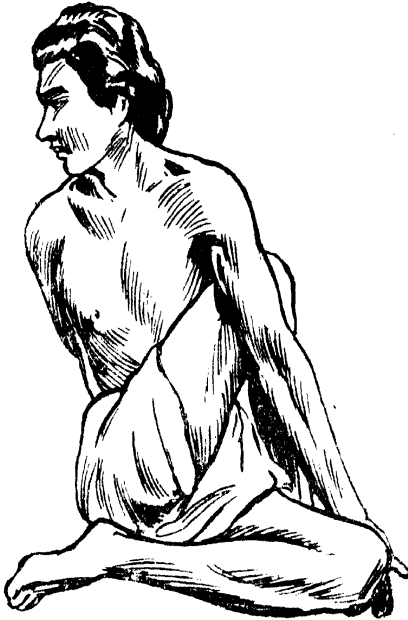
১৯নং চিত্র

শ্বাস স্বাভাবিকভাবে চলিতে থাকিবে।

এই আসনে শিরদাঁড়ার দুইপাশের মাংসপেশী সক্রিয় ও মেরুদণ্ড নমনীয় থাকে; কোষ্ঠকাঠিন্য ও কোমরের মেদ কমিয়া যায়। পশ্চিমোত্তানাসন

ধনুরাসন ও অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন মেরুদণ্ডকে যথাক্রমে সামনে পিছনে ও দুই পাশে সঞ্চালিত করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও কার্যক্ষম রাখে।

১২। শবাসন

২০নং চিত্রের ভঙ্গিতে হাত দুটি দুইপাশে মেলিয়া সটান চিত হইয়া শুইয়া পড়। সমস্ত মাংসপেশী শিথিল করিয়া মড়ার মত অসাড় ও শান্তভাবে পাড়য়া থাক। ঐ সঙ্গে মনটাকেও নিষ্ক্রিয় ও অসাড় করিবার চেষ্টা কর, যেন

২০ নং চিত্র

তোমার দেহে তুমি নাই। এইভাবে ২।৩ মিনিট থাকিলেই যথেষ্ট। প্রত্যেক আসন শেষ করিয়া ১ মিঃ কাল এই আসনে থাকিবে। আর, সকল ব্যায়াম শেষে অন্ততঃ ৫ মিঃ কাল শবাসন করিবে।

শ্বাস :—স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক।

এই আসনে ক্লান্তি দূর হয়; সমস্ত দেহ ও মন বিশ্রাম পায়; হৃদ্‌যন্ত্র, স্নায়ুমণ্ডলী ও মাংসপেশী সুস্থ থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পবন-মুক্তাসন, গোমুখাসন, সর্বাঙ্গাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, ধনুরাসন ও অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন ও শবাসন মিলিয়া দৈহিক স্বাস্থ্যপ্রদ আসন অভ্যাসের সংক্ষিপ্ত পূর্ণক্রম (a full course in short)। শবাসনের বিশেষ বিধি মনে রাখিয়া পর পর এই আসনগুলি করিয়া গেলে মোটামুটি স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহগঠন হইতে পারে।

ব্যায়ামের সাধারণ নিয়ম

১। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম করা উচিত, অনেক ডনগীর সপ্তাহে একদিন ব্যায়াম বাদ দেন।

২। ব্যায়াম করার বা খেলার সময় কথা বলা, শব্দ করা বা বাজে আলাপ করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

৩। প্রত্যহ প্রাতঃকালে শৌচকর্মাদি করিবার পর খালি পেটে ব্যায়াম করাই প্রকৃষ্ট রীতি। কেহ কেহ অতি সামান্য খাবার খাইয়া ব্যায়াম করিয়া থাকেন।

৪। ব্যায়াম করিবার সময় নাসিকা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে হয়। মুখ দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে নাই।

৫। ল্যাঙট, কৌপীন, জাঙ্গিয়া ভাল করিয়া পরিয়া ব্যায়াম করা উচিত। ল্যাঙট বা কৌপিনাদি না পরিয়া কখনও ব্যায়াম করা উচিত নয়।

৬। ব্যায়ামাদি করিবার সময় অস্বাভাবিক মুখভঙ্গী বর্জনীয়। অনেকে ব্যায়ামের সময় দাঁতমুখ খিঁচাইয়া থাকেন। উহাতে শরীরের সুগঠন ও সুডৌল নষ্ট হয়।

৭। উপযুক্ত পরিশ্রম না হওয়া পর্যন্ত এক দমে ব্যায়াম করা উচিত।

৮। সম্ভব হইলে আয়নার সাম্নে ব্যায়াম করাই ভাল। ইহাতে দ্রুত উন্নতি হইয়া থাকে।

৯। ব্যায়াম করিবার সময় শুধু নিজের শরীরের উপরই মনটিকে নিবদ্ধ রাখিবে। মন যেন বিক্ষিপ্ত না হয়।

১০। সর্বোপরি নৈতিক চরিত্রের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখা উচিত। ইন্দ্রিয় সংযম ও ব্যায়াম পরস্পর সাপেক্ষ ও সহায়ক।

আসন করিবার সাধারণ নিয়ম

১। সুস্থ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ সকাল, সন্ধ্যা বা স্নানের পূর্বে আসন অভ্যাস করিতে পারেন।

২। আসনের গুণাগুণ বুঝিয়া প্রয়োজন মত ৪।৫টী আসন করিলেই যথেষ্ট। রোগীদের পক্ষে বেশি আসন করা উচিত নয়।

৩। একবারে ধারাবাহিক ভাবে ছয়টির বেশি আসন করা উচিত নয়।

৪। প্রথম দিকে একটি আসন পরপর তিনবার করিয়া প্রায় এক মিনিট শবাসনে থাকিতে হইবে। পরে অন্য আসন আরম্ভ করিতে হইবে।

৫। একাসনে সহজ ভাবে ও সাধ্যমত যতক্ষণ পারা যায় থাকিতে হইবে। পরে ২০-৩০ সেকেণ্ড শবাসন করিয়া আবার ঐ আসনই করিতে হইবে।

৬। এইরূপ অভ্যাসের ফলে দীর্ঘকাল একাসনে থাকিবার সামর্থ্য জন্মিবে। তখন আর পর পর তিনবার একই আসন না করিয়া যতক্ষণ সম্ভব একাসনে থাকিবে, পরে শবাসন করিয়া নূতন আসন আরম্ভ করিবে।

৭। দীর্ঘকাল একাসনে থাকিবার অভ্যাস হইলেও গৃহীদের পক্ষে একাসনে ৩ মিনিটের বেশি থাকা উচিত নহে।

৮। সুস্থ ব্যক্তি আসন করিবার পূর্বে সামান্য ডন করিয়া শরীরের রক্ত চলাচল বাড়াইয়া লইবে। পরে সামান্য বিশ্রামের পর আসন অভ্যাস করিবে। ইহাতে দ্রুত ফল হয়।

৯। পূর্ণ মাত্রায় অন্য ব্যায়াম করিয়াও তাহার সঙ্গে আসন করা চলে। তখন অন্য ব্যায়ামের পর বিশ্রাম লইয়া ধীরস্থির ভাবে আসন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে করিবে আসন করিয়া স্নায়ু সতেজ ও দেহ শক্তিশালী হইতেছে।

১০। প্রাতঃকালই আসন করিবার উৎকৃষ্ট সময়। তাই বলিয়া অন্য সময়ে যে করা যায় না এবং করিলে যে ফল হয় না তাহা নয়।

এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে ননীলালের জীবনে একটি পরিবর্তন আনিয়া দেয়। ইহারই ফলে আমরা সাধারণ বাঙালী ছোক্‌রা ননীলালকে আজ অসাধারণ অসিনিপুণ দেখিবার অবসর পাইয়াছি। ননীলাল একবার এক চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পূজার মেলা দেখিতে যান। সেই মেলায় একটা মারামারি হয়। এক বুড়ো অনেকগুলি লোককে শুধু লাঠির জোরে হঠাইয়া দিতেছিল। অথচ যাহারা মার খাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বড় বড় পালোয়ান এবং শক্ত-সমর্থ লোকও ছিল। কিন্তু মজা এই, একটি লোকের লাঠির ঘায়ে এতগুলি লোক ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল। দেখিয়া ননীলাল অবাক্ হইলেন, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়া পারি লাঠি শিখিবই। তারপর খুঁজিতে খুঁজিতে সেই লোকটির বাড়ী গেলেন। তাহাকে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন—"আমাকে লাঠি শিখাতে হবে।" সে বলিল—"তুই ছেলে মানুষ, তুই কি শিখ্‌বি ?"

এই লোকটির নাম ছিল আব্বাস। ইহার নিকট ননীলাল কিছুকাল লাঠি শিখিলেন। তারপর বনমালী নামে একজন বাগ্‌দীর নিকট হইতে লাঠি শিক্ষা করেন।

এই সময়ে কলিকাতায় শ্রদ্ধেয়া সরলাদেবী চৌধুরাণীর বাড়ীতে বীরাষ্টমী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। ইহাই বাঙ্‌লা দেশে প্রথম বীরাষ্টমী উৎসব। সে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। বাঙ্‌লা দেশে শরীর-চর্চার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া দেশের দুর্বল পঙ্গু ও হতবীর্য তরুণদলকে স্বাস্থ্যে ও শৌর্যে

শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিবার ইহাই প্রথম সংহত প্রচেষ্টা। সেবারকার এই বীরাষ্টমী উৎসব দেখিতে ননীলাল শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর বাড়ীতে যান। সেখানে বাঙলার অনেক বিখ্যাত খেলোয়ার সমবেত হন। রাজপুতনা, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের অনেক অসিনিপুণ এবং মল্লবীরও ইহাতে উপস্থিত হন। এই উৎসবের তলোয়ার খেলা দেখিয়া ননীলালের খুব ইচ্ছা হয়, একটু তলোয়ার ঘুরাইয়া দেখান। তখনও কিন্তু তিনি তলোয়ারের একরকম কিছুই জানেন না এবং শিখেনও নাই। কেবল লাঠি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন তাহারাই অভিজ্ঞতা ও ভরসায় তলোয়ার লইয়া খেলার আসরে নামিয়া পড়িলেন। সে সময়ে তাঁর বয়স চৌদ্দ পনের বছর। এতটুকু ছেলেকে এমন সুন্দর তলোয়ার ঘুরাইতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই খুব সন্তুষ্ট হন এবং খুশী হইয়া তাঁহাকে একটি মেডেল পুরস্কার দেন। সেই হইতে শ্রদ্ধেয়া সরলাদেবী ননীলালকে আপদে বিপদে সাহায্য করিয়াছেন, যখন সকলে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে, তখন বীরাঙ্গনা মাতৃমূর্তিই তাঁহাকে ও তাঁহার দলকে বুক-ভরা স্নেহ দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। বীরাষ্টমীর এই প্রথম সফলতাই তাঁহাকে সব সময় উৎসাহের ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, তলোয়ার শিখিতে হইবে।

এই সময় মল্লিকলেনে ননীলাল নিজেই একটা আখ্ড়া খোলেন সেখানে নূতন উদ্যমে কুস্তি ও লাঠির চর্চা করিতে থাকেন এবং ছোট ছোট ছেলেদিগকে শিক্ষা দিয়া ভাল কুস্তিগীর ও লাঠিয়াল করিয়া গড়িয়া তোলেন।

ননীলাল

(একাকী শিল্ডসহ তলোয়ার হাতে সমবেত আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন।)

শ্যামাকান্ত সন্ন্যাসাশ্রমে (সোঽহং স্বামী

শ্যামাকান্ত

বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষিত ও তরুণ দলে যে দুই কৃতী পুরুষ শরীর-চর্চা ও সাহসিকতার প্রথম প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের একজন স্বনামখ্যাত মল্লবীর শ্যামাকান্ত, আর একজন তাঁহারই সুহৃদ্ ও সহযোগী পরেশনাথ। ইঁহাদের পূর্বে বাঙালীর শতমুখী প্রতিভার এই দিক্‌টা দেশের তরুণদের কাছে রুদ্ধ ছিল। শিক্ষিত সমাজে উহার বড় একটা আদর ছিল না। শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথের সাধনা ও তপস্যা তরুণ বাঙ্‌লার প্রাণে একটা নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিল, নব উৎসাহের দীপ্ত প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া ধরিল। আত্মবিস্মৃত জাতির হৃদয়ে অতীতের গৌরব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বাঙালী বুঝিল, জগতের বীর-সভায় তাহার আসনখানা কারো চেয়ে একটুও ন্যূন বা নীচু নয়।

সে বড় বেশী দিনের কথা নয়। সিপাহী-বিপ্লব শেষ হইয়া গিয়াছে। ইংরেজী ১৮৫৮ সাল, বাঙ্‌লা ১২৬৫ সন। এই বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

গ্যারীবল্ডীর মত নাম করা, শ্যামাকান্তেরও মনে তখন সে কল্পনা জাগিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে সেনা হওয়া বা যুদ্ধবিদ্যা শিখার সখটা বাঙালীর পক্ষে একটা বে-আইনী বে-আদবী। কি করেন, ইংরেজ সরকার তো তাঁহাকে সেনাবিভাগে ঢুকিতে দিবে না। কাজেই শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথ দুই বন্ধুতে মিলিয়া জটলা করিলেন। পরামর্শ হইল, কোন দেশীয় রাজ্যে যাইয়া সৈনিক বিভাগে ঢুকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিবেন। একদিন দুই বন্ধু বাড়ী ছাড়িয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন। গোয়ালিয়র প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত সৈনিক বিভাগে যে ঘৃণিত দাসত্ব-পরায়ণতা ও দুর্নীতি দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহাদের সেনা হইবার সাধ মিটিল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলে শ্যামাকান্ত বিবাহ করেন। বিবাহের কয়েকমাস পর শ্যামাকান্ত একবার আগড়তলা বেড়াইতে যান। আগড়তলা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তখন ত্রিপুরার রাজা। শ্যামাকান্তের শারীরিক শক্তি ও ব্যায়াম-পটুতার কথা তিনি আগেই শুনিয়াছিলেন। এখন, তাঁহার ব্যায়াম-কৌশল ও দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর দেখিয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বচর নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। শ্যামাকান্ত পিতার নিকট লিখিলেন। তারপর, পিতার অনুমতি পাইয়া মহারাজের সহচর নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ শ্যামাকান্তকে তখন হইতেই খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার যখন যাহা-কিছু দরকার হইত তখনি তাহা দিতেন। শ্যামাকান্ত দুই বছর মহাজের কাছে থাকেন।

তারপর কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় সে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। ত্রিপুরা ছাড়িলেও ত্রিপুরা-রাজ তাঁহাকে ভুলেন নাই। শ্যামাকান্ত যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মহারাজের অনুগ্রহ ও অনুরাগ হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই। পরবর্ত্তী কালে যখনই তিনি তাঁহার সার্কাস লইয়া আগড়তলা গিয়াছেন, সব সময়েই মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে সমাদর করিয়া নিতেন এবং পুরস্কৃত করিয়া সম্মানিত করিতেন।

আগড়তলা ছাড়িয়া শ্যামাকান্ত বরিশাল জিলা স্কুলে আসিয়া ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ই তিনি একটি সার্কাসের দল গড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহাকে এ কাজ করিতে নিষেধ করেন। সকলেই বলিলেন, এ কাজে বিপদের সম্ভাবনা ও জীবনের আশঙ্কা খুব বেশী। কিন্তু স্বাধীন-চেতা শ্যামাকান্ত মরণ-বাঁচনকে বড় বেশী একটা গ্রাহ্য করিতেন না। তাই, আঠার বছরের যুবক এমনতর কাজে লাগিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জে তিনি একটি চিতা বাঘ ক্রয় করিলেন। এইটিই তাঁহার প্রথম বাঘ। আফিং বা কোন মাদক দ্রব্যের দ্বারা অনেকে বাঘ বশ করিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ডনগীর স্যাণ্ডো একবার এক সিংহের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। সে সিংহটীর থাবা, মুখ প্রভৃতি মারাত্মক অঙ্গগুলি চামড়া দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং নখ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শ্যামাকান্ত ও-সব ভড়ং-কায়দার ধার ধারিতেন না। তিনি সোজা খাঁচার ভিতর ঢুকিতেন, তারপর জোর-জবরদস্তি করিয়া রীতিমত লড়াই

জুড়িয়া দিতেন। এমন করিয়া দুই মাস মধ্যেই সেই বাঘটাকে বশ করিয়া সেই সুনামগঞ্জেই উহার সহিত খেলা জুড়িয়া দিলেন। বাঘের খেলায় এই তাঁর প্রথম চেষ্টা, এবং সে চেষ্টা সফল হইল। এই বাঘটা বশ করিতে তাঁহাকে অনেকবার নখ ও দন্তাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইয়াছে। ধীরে ধীরে তাঁহার সাহস ও মনের জোর বাড়িল, অভিজ্ঞতা জন্মিল। এখন তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ বন্য ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি যে কোন হিংস্র জন্তু বশ করিতে পারিতেন। হাসিতে হাসিতে পিঞ্জরমধ্যে ঢুকিয়া এই সকল হিংস্র জন্তুর সহিত রোমাঞ্চকর খেলা করিতেন। শ্যামাকান্তের চোখের তীব্র চাহনিতে বাঘ যেন আপনি নিস্তেজ হইয়া পড়িত। এখন হইতে দেশময় শ্যামাকান্তের নাম পড়িয়া গেল। এই সময়ে ভাওয়ালের জয়দেবপুরের রাজা একটি সুন্দরবনের "রয়েল বেঙ্গল" বাঘ ধরিয়া আনেন। ঐ বাঘটী তিনি শ্যামাকান্তের শক্তি ও সাহসের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

শ্যামাকান্তের হাত দুইটিতে অসাধারণ বল ছিল এবং মনে অমানুষিক জোর ছিল। তাই তিনি হিংস্র বাঘের সঙ্গে এমন নির্ভীব ভাবে লড়িতে পারিতেন। বাঘের থাবায় কত জোর রাখে, একটা গল্প বলি। ভাওয়াল-রাজ যে বাঘটা উপহার দিয়াছিলেন, সেই বাঘটা শ্যামাকান্ত ট্রেনে চাপাইয়া ঢাকা লইয়া আসিলেন এব পরেশনাথের আখড়ায় উহাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন এই বাঘটার নাম ছিল গোপাল। বাঘটার নিকটেই পরেশনা বসিয়া আছেন এবং বাঘের শরীরে কি রকম জোর থাকিতে পা

সেই সব কথাবার্তা চলিতেছে। পরেশনাথ বাঘের সহিত কোনদিন খেলাও করেন নাই, বাঘের শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় বাঘটা হঠাৎ উঠিয়া পরেশনাথকে এমন একটা চাপড় মারিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেলেন। বাঘের একটি থাবায় কেমন জোর! চারিমণ ওজনের মানুষটি এক চাপড়েই একেবারে কাৎ।

শ্যামাকান্ত তাঁহার সমস্ত হাতখানি জ্যান্ত বাঘের মুখে ঢুকাইয়া দিতেন। বাঘটা দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি নখর হাতে এমন বিঁধাইয়া দিত যে টস্ টস্ করিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িত। কিন্তু তিনি উহা ধীর ভাবে সহ্য করিতেন, বাঘকেও বুঝিতে দিতেন না যে সে কামড় দিয়াছে। ইহা দেখিয়া একবার কাশীতে এক সাহেব-সৈনিক বলিয়াছিলেন—আমি একজন সৈনিক, মরণকে কোন দিন ভয় করি না। কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত মেডেল আমাকে দিলেও আমি এমন বিপজ্জনক কাজ করিতে রাজী নই।

একবার শ্যামাকান্ত বাঘের খেলা দেখাইতে গৌরীপুর যান। সে বাঘটার নাম ছিল রাজা এবং বাঘটাও খুব দুর্দান্ত ছিল। এ বাঘটাও ভাওয়াল-রাজের প্রদত্ত। শ্যামাকান্ত সাধারণতঃ এক দরজাওয়ালা খাঁচার ভিতর বাঘের সঙ্গে খেলিতেন। এ খাঁচায় খেলাটা একটু বিপজ্জনক। শ্যামাকান্ত খেলা শেষ করিয়া যেই পশ্চাতে হটিয়া বাহিরে এক পা বাড়াইয়াছেন, অমনি বাঘটা তাঁহার মুখে এক থাবা মারিয়াছে। তিনি দেখিলেন, বড়ই বিপদ্। যদি তিনি বাহির হইয়া আসেন তবে বাঘও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিবে! কারণ,

খেলা শেষ হওয়ার সঙ্কেত শুনিয়াও বাঘটাকে শিকল দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয় নাই। অথচ বাহিরে এত লোক—বাঘ ছুটিলে আর রক্ষা নাই। তিনি আবার ধীর ভাবে খাঁচায় ঢুকিলেন এবং উপর হইতে শিকল ফেলিয়া বাঘটাকে বাঁধিতে ইঙ্গিত করিলেন। তারপর, শিকল পড়িবামাত্র এক ধাক্কা দিয়া বাঘটাকে ফেলিয়া দিয়া খাঁচার বাহির হইয়া আসিলেন।

চুঁচুড়ায় একবার এমনতর একটি ঘটনা হয়। সেবার শ্যামাকান্ত বাঘের মুখে মাংসের টুকরা ফেলিয়া শান্ত ভাবে মাথা বাঁচাইয়া সরিয়া পড়েন।

এমন ধীর ও শান্ত ভাবে অসীম সাহসিকতার পরিচয় মনের উপর কত বড় আধিপত্য জন্মিলে সম্ভবপর হয়, ভাবিবার বিষয়। শ্যামাকান্তের মন তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মবশে ছিল।

একবার পাটনার নবাব একটি প্রকাণ্ড বাঘিনী ধরেন। শ্যামাকান্তকে এই বাঘিনীটার সহিত কুস্তি লড়িতে আহ্বান করা হয়—পুরস্কার দু'হাজার টাকা। এমন একটা বন্য হিংস্র জন্তুর সহিত মানুষ লড়িতে পারে ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না। দেশময় এ সংবাদ রটিয়া গেল,—কাগজে কাগজে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শহর ভাঙ্গিয়া লোক দলে দলে খেলা দেখিতে ছুটিল। মনে হইল, আবার বুঝি রোমের বিলাসী নরনারীর সাধের সেই গ্ল্যাডিয়েটারদের খেলা ফিরিয়া আসিল। এই উৎকণ্ঠিত বিশাল জনসঙ্ঘের সম্মুখে বাঙ্‌লার তেজীয়ান যুবক বীর শ্যামাকান্ত তাঁহার শুভ্র বিরাট দেহখানি লইয়া যখন আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন চারিদিকে তাঁহার

শ্যামাকান্ত

জয়ধ্বনি উঠিল, সেই বিশাল জনসঙ্ঘ কোলাহলে মুখরিত হইল—তারপর সব নীরব নিস্তব্ধ! সকলের মুখে-চোখেই উদ্বেগের ভাব, কি যেন কি হয়। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সেই বন্য বাঘিনীটাকে মেষ-শাবকের মত পদদলিত করিয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে যখন তরুণ বীর শ্যামাকান্ত গর্বিত বক্ষে দাঁড়াইয়া উঠিয়া জয়োন্নত মস্তকে অভিনন্দন জানাইলেন—অমনি আবার হাজার কণ্ঠে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। নবাব বাহাদুর নগদ দু' হাজার টাকা, দুইটি আরব দেশীয় ঘোড়া এবং সেই সদ্যোধৃত বাঘিনীটা শ্যামাকান্তকে দান করিলেন। এই বাঘিনীটার নাম ছিল বেগম।

১৮৯৪ সালে শ্যামাকান্ত মাসিক ১৫০০৲ শত টাকা বেতনে ফ্রেড্ কুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হন। সে সময় ঐ সার্কাসওয়ালাদের মধ্যে তিনি শারীরিক শক্তি ও সাহসে সকলের চেয়ে বড় ছিলেন। এক বৎসর কাজ করিবার পর তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন। ইহার পর তিনি তাঁহার নিজের সার্কাস দল লইয়া নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ান। ক্রমে তিনি রামগোপালপুর, কুচবিহার, ঢাকা, কলিকাতা, পাটনা, রংপুর, আগড়তলা প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখান। একবার কিছুদিন তিনি রংপুর অবস্থান করেন। সেখানে এক তেতালা বাড়ীর নীচে তাঁহার পশুশালা ছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ঐ বাড়ী পড়িয়া যায়। তাহাতে ঘোড়া, বানর, কুকুর, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু ও সার্কাসের সমুদায় আসবাবপত্র নষ্ট হইয়া যায়। দুইটি বাঘ বাহিরে ছিল বলিয়া বাঁচিয়া যায়। এই বাঘ দুইটি লইয়া বছরখানেক

কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে বাঘে কুকুরে খেলা, বাঘের সহিত কুস্তি এবং অন্যান্য খেলা দেখান। পরে "Grand Show of Wild Animals" নাম দিয়া একটা বড় ও নূতন রকমের খেলা আরম্ভ করেন। ইহাতে হাতী, কতকগুলি বাঘ, বানর ও কুকুরের খেলা ছিল। ইহাই তাঁহার কর্মজীবনের শেষ খেলা।

শ্যামাকান্তের খেলার মধ্যে বুকে পাথর ভাঙ্গা ছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমাদের দেশে শ্যামাকান্তই সর্বপ্রথম এই খেলা দেখাইয়া বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন।

বুকের উপর পাথর ভাঙ্গার কসরতে তাঁর সবচেয়ে বেশী নাম হয়। "ঘাড়ের নীচে একখানা চেয়ার, আর পা দুটির নীচে আর একখানা চেয়ার রাখিয়া তিনি দেহটীকে ঠিক একটি সাঁকোর মত করিয়া রাখিতেন, আর তাহার উপরে ১২।১৪ মণ পাথর চাপাইয়া দেওয়া হইত। তারপর, যে কেহ এক প্রকাণ্ড লোহার হাতুরি দিয়া সেই পাথরের উপর ঘা মারিতে থাকিত।" ঘা খাইয়া পাথর ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত, কিন্তু সে পাষাণ বক্ষ টলিত না। শ্যামাকান্ত সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ মণ পর্যন্ত ওজনের পাথরই ব্যবহার করিতেন; কিন্তু ছোট লাটের বাড়ীতে একবার খেলা দেখাইবার সময় ১৪ মণ ওজনের পাথর বুকে লইয়াছিলেন। কয়েকজন জবরদস্ত গোরা সেনা বক্ষস্থিত প্রস্ত-খণ্ডের উপর প্রকাণ্ড মুগুরের ভীষণ আঘাত করিয়াও তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

শ্যামাকান্ত আর একটি বড় আশ্চর্য খেলা খেলিতেন। শূন্যে পা-দুটা হুকে সংলগ্ন করিয়া তিনি সমস্ত শরীর নীচে ঝুলাইয়া

দিতেন। তারপর মাটি হইতে চারি জন বলিষ্ঠ লোককে উপরে তুলিয়া উঠাইতেন।

একবার এল্‌মো (Elmo) নামে মস্ত জোয়ান এক পালোয়ান আসেন। কলিকাতা গড়ের মাঠে এল্‌মোর সহিত তাঁহার মুষ্টি-যুদ্ধ (Boxing) হয়। তিন মিনিট খেলার পর শ্যামাকান্ত তাহাকে এমন এক আছাড় মারিয়াছিলেন যে ১৫ মিনিট তাহার চৈতন্যই হয় নাই। বাঙালীর মান সম্ভ্রম এমন ভাবে ধরিয়া তুলিতে পারায় সেই বিশাল জনসঙ্ঘের বাঙালী-কণ্ঠে শ্যামাকান্তের জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। কিন্তু মেম-সাহেবেরা ত চটিয়া লাল! তাহারা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "That's illegal." ওটা অন্যায়, বিধি-বিরুদ্ধ। শ্যামাকান্ত গর্বিতকণ্ঠে জবাব দিলেন, "He can stand the shock of being thrown away. But from the standpoint of a boxer, I purposely avoided the calumny of being a murderer."—ফেলে দেয়েছি, সে ধাক্কাটা উনি সহ্য কর্‌তে পার্‌বেন বলেই, পাছে নর-ঘাতক হই এই অখ্যাতিটা এড়াবার জন্যই বেশী চোট দি নাই, সেটা মুষ্টি-যুদ্ধের নিয়ম নয়।

একদিন ঢাকায় স্বর্গীয় পরেশনাথ ঘোষ, বসন্তদেব চৌধুরী প্রভৃতি বন্ধুদিগের সম্মুখে শ্যামাকান্ত ১৪ মণ ওজনের একটা কামানের ন্যায় বিপুলাকৃতি লৌহ-খণ্ডকে মাথার উপর তুলিয়া উহা কয়েক বার ভাজিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

শ্যামাকান্তের মুষ্টিতে এত জোর ছিল যে দেয়ালের গায়ে ঘুসি দিলে চূণ সুরকী ও ইটের গুঁড়া ঝুর ঝুর করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত।

একবার পশ্চিম অঞ্চলে এক ট্রেনে এক বাঙালী মুন্সেফ বাবু তাঁহার ভার্যাসহ যাইতেছিলেন। দিনাপুর স্টেশনের নিকট তিনজন গোরা এই ভদ্র-মহিলার অবমাননার চেষ্টা করে। এমন সময় শ্যামাকান্ত যমের মত আসিয়া এই তিনটি গোরাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি একক তিনজনের সঙ্গে সমানে ঘুষি চালাইলেন। শ্যামাকান্তের বজ্র মুষ্টির আস্বাদ পাইয়া তিনটি দৈত্য তিনদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। মুন্সেফ-পত্নীর মর্যাদা রক্ষা পাইল।

ছোটকাল হইতেই শ্যামাকান্ত ধর্মপিপাসু ছিলেন। ধর্মের বীজ বাল্যেই তাঁহার জীবনে উপ্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলায় "ল্যাংটা বাবা বা পাগলা বাবা" নামে এক প্রাচীন সন্ন্যাসী ছিলেন। ইঁহার ব্যবহার বা কথাবার্তায় কেহ কোনদিন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, ইনি কোন্ জাতীয় বা কোন ধর্মীয়। এই মহাত্মার সহিত শ্যামাকান্তের বাবার সাক্ষাৎ হয় এবং সেই উপলক্ষে শ্যামাকান্তও ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই তাঁহার ধর্ম-জীবনের সূত্রপাত।

১৮৯৯ সালে শ্যামাকান্তের বাবা মারা যান। ইহার পরই তিনি বাড়ী ছাড়িয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার বয়স ৪২ বছর, স্ত্রী ও কন্যা বর্তমান। গৃহত্যাগ করিয়া তিনি কাশী নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তিনি যখন কাশী ছিলেন তখন সেখানে এক বৃদ্ধ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইঁহার আদি নাম নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, বাড়ী শ্রীহট্ট জেলায়। ইনি ষোল বছরের সময়ে সন্ন্যাস

হইয়া তিব্বত, চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়ান। ইনি ৩২ বছর তিব্বতে ছিলেন বলিয়া সাধারণের নিকট ‘তিব্বতী বাবা” বলিয়াই বিখ্যাত। ইহারই নিকট শ্যামাকান্ত দীক্ষিত হন এবং ইনি সর্ব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে আহ্বান করিয়া সর্বসমক্ষে শ্যামাকান্তকে “সোঽহংস্বামী” এই নাম দেন। সেই হইতে সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত সোঽহংস্বামী বলিয়াই পরিচিত।

ইহার পর হইতে সোঽহংস্বামী নাইনিতালের সাত মাইল দূরবর্তী হিমালয়ের কোলে ভাওয়ালী নামক স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতেন। আশ্রমটী শ্মশানভূমির নিকটবর্তী, পাশে কল কল স্বরে নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে—প্রকৃতির শোভা-সম্পদে চারিদিক্ ঘেরা।

এই আশ্রমে বাস করিবার সময় একদিন শ্যামাকান্ত বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখেন, দূরে কতকগুলি পাহাড়ী লোক হল্লা করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটি গোরা ছোরা লইয়া উহাদিগকে মারিতে উঠিয়াছে। তিনি অনেক বুঝাইলেন, গোরাটা মদের নেশায় বিভোর, কার কথা কে শুনে? তখন শ্যামাকান্ত জোর করিয়া গোরাটাকে ধরিয়া আনিয়া আশ্রমে বাঁধিয়া রাখিলেন। পরদিন ভোরে তাহাদের অফিসারের নিকট সকল কথা বলিয়া দিয়া আসিলেন।

এই সময় শ্যামাকান্ত অনেক বই লিখেন। এই সমস্ত বইতে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সোঽহংগীতা, সোঽহংতত্ত্ব, সোঽহং-সংহিতা, বিবেকগাথা, Truth,

ভগবদ্‌গীতার সমালোচনা—এই কয়খানাই প্রধান। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গীতার সমালোচনা লিখিয়া যান। সাধনপথে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, জ্ঞানমার্গাবলম্বী।

শ্যামাকান্তের জীবনে ভয় বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। সমাজিক ভয়, শাস্ত্রের ভয়, পরলোকের ভয়, মরণের ভয়—কোন প্রকার ভয় কোন দিন তাঁহার জীবনে ঠাঁই পায় নাই।

১৯১৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর হিমালয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধ-ক্রোড়ে বাঙ্‌লাদেশের এই খাঁটী মানুষ সিংহপ্রতিম সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

পরেশনাথ

ঢাকা শহরের অপর তীরে বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পাড়ে শুভাঢ্যা গ্রামখানি অবস্থিত। এই গ্রামে ১২৬৩ সনের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৮৫৬ সালে) পূর্ব-বাঙ্‌লার বিখ্যাত মল্লবীর স্বর্গীয় পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণের নিকট ইনি পার্শ্বনাথ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরেশনাথের বাবার নাম ৺সীতানাথ ঘোষ এবং তাঁহার ঠাকুরদাদার নাম ৺নীলমণি ঘোষ। ইঁহারা সকলেই বেশ সুস্থ-সবল ও দীর্ঘজীবী ছিলেন।

শুভ্যাঢ্যা গ্রামে একটি মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল ছিল। এখানেই পরেশনাথের বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হয়। এই স্কুল হইতে চারি টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন এবং বাঙ্‌লা প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান লাভ করেন।

ছোটকাল হইতেই ব্যায়াম চর্চার দিকে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি গ্রামে একটি আখ্‌ড়া স্থাপন করিয়া সেখানে গ্রামের ছেলেদের লইয়া মহোৎসাহে কুস্তি-কসরৎ শুরু করিয়া দিলেন।

১২৭৮ সনে শুভাঢ্যা গ্রামেরই ৺অদ্বৈতচরণ দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স পনের কি ষোল বছর।

গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করিয়া পরেশনাথ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইলেন। এই সময়েই তাঁহার জীবনের গতি স্থির হইল এবং পরবর্তী কালে শক্তিমত্তার জন্য তিনি যে খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিত্তি পত্তন হইল। লক্ষ্মীবাজারের স্বর্গীয় অধর ঘোষ তখন নাম-করা পালোয়ান। পরেশনাথ এই সময় তাঁহার নিকট পরিচিত হইলেন। শ্যামাকান্তের সহিত এই সময়েই তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। পরেশনাথ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত শ্যামাকান্ত, স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ বন্ধুদিগকে লইয়া কুস্তি ও ব্যায়ামাদি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অধর ঘোষ নিজেও একজন ভাল কুস্তিগীর ছিলেন; তার উপর এই সমস্ত যুবকদিগের তরুণ উৎসাহ তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিল। তিনি সযত্নে ও সস্নেহে উহাদিগকে কুস্তি শিখাইতে লাগিলেন।

১২৮:-৮৪ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে পরেশনাথ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। এই সময়টায় ইঁহাদের মনে সৈনিক হওয়ার সাধ জাগে। পরীক্ষা দিয়া তিনি শ্যামাকান্তকে সঙ্গে লইয়া আগ্রা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে বাহির হইলেন। এই সময় অনেক স্থানে তাঁহারা ঐ দেশীয় পালোয়ানদের সাথে কুস্তি লড়েন এবং শারীরিক কসরৎ দেখান। গোয়ালিয়রের মহারাজার পালোয়ানের সহিত কুস্তিতে পরেশনাথ বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন তাহা সফল হইল না। সৈনিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া বন্ধুদ্বয় দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পরেশনাথ

পরেশনাথ কলিকাতা আসিয়া সিটি কলেজে ভর্তি হইলেন। তখনকার দিনে আই. এ. (এফ. এ.) তে অঙ্ক অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকেই অঙ্ক লইতে হইত। কিন্তু পরেশনাথ ইংরেজীতে বেশ পাকা হইলেও অঙ্কে ভয়ানক কাঁচা ছিলেন। আই.এ. পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল হইলেন। তারপর আরো দুইবার পরীক্ষা দিলেন, প্রত্যেক বারেই অঙ্কে ফেল হইলেন। তিনবার একই পরীক্ষায় ফেল হওয়াতে পরেশনাথের শ্বশুর মহাশয় পড়ার খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরেশনাথ দমিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়-শক্তি ছিল। তিনি ছাত্র পড়াইয়া কলেজের পড়া চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব তরুণ দলে খুব বেশী। পরেশনাথও সে প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া পরেশনাথ অনেক মহানুভব ব্যক্তির নিকট নানারূপ অর্থসাহায্য পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডাঃ পি. কে. রায় অন্যতম। ইঁহারা পরেশনাথকে খুব স্নেহ করিতেন ও উৎসাহ দিতেন এবং পরেশনাথও ইঁহাদিগকে অতিশয় ভক্তি করিতেন।

এইরূপে পাঁচ বৎসর চেষ্টার পর আই. এ. পাশ করেন। আই. এ. পাশ করিয়া ঢাকা কলেজে আসিয়া বি. এ. পড়িতে ভর্তি হইলেন। ১২৯১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে তিনি একবার খুব কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন এবং অনেকদিন শয্যাগত থাকেন। পরেশনাথ পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর আর পড়াশুনা করেন নাই।

ছোটকাল হইতে নৈতিক চরিত্রের উপর পরেশনাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার অন্তরের বন্ধু এবং প্রধান সহযোগী ও সহকর্মী শ্যামাকান্ত তাঁহার আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

পরেশনাথের শারীরিক শক্তির চরম উৎকর্ষের কাল ১২৭৮—১২৯০ সাল এই বার বছর। এই সময়ে তাঁহার শরীর বিশাল ও সুষ্ঠু হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। শরীরটি ছিল সুগোল, বর্ণ অনুজ্জ্বল গৌর, শারীরিক সৌষ্ঠব অতুলনীয়। তাঁহার ওজন তখন ছিল তিন মণ চৌদ্দ পনের সের। সব চেয়ে যখন তাঁহার বেশী ওজন হইয়াছিল, তখন চারি মণের উপরে গিয়াছিলেন।

পরেশনাথ কলেজের পড়া শেষ করিয়া ১২৯১—৯২ সালে ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। মরণ পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের মস্টারী করিয়া গিয়াছেন। স্কুলে তিনি ইংরেজী পড়াইতেন। পরেশনাথের আমলে যে সমস্ত ছেলের জুবিলী স্কুলে পড়িবার সুযোগ হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি একটা গভীর দাগ রাখিয়া গিয়াছে।

পরেশনাথ বড় অমায়িক ও সামাজিক লোক ছিলেন। তিনি হাস্যকর গল্প বলিয়া লোকদের হাসাইতে পারিতেন। পরেশনাথ ক্লাসের ছেলেদের মজার মজার রূপকথা ও হাসির গল্প বলিতেন।

সে সময়ে ঢাকা সহরে যত কুস্তিগীর পালোয়ান আসিয়াছেন, সকলেই পরেশনাথের আতিথ্য ও আদরে আপ্যায়িত হইয়াছেন। ঢাকা শহরে আসিয়া পরেশনাথের আখ্ড়ার মাটি না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান সেকালে ছিল না। তখন ঢাকায় যত কুস্তির প্রতিযোগিতা

হইত, সমস্তই পরেশনাথের পরিদর্শনে ও পরিচালনায় সম্পূর্ণ হইত। সকলেই পরেশনাথের বিচার মাথা পাতিয়া নিয়া খুশী হইয়া চলিয়া যাইত।

পরেশনাথের সন্তান-সন্ততির মধ্যে দুইটি মেয়ে মাত্র বর্তমান। তাহারা উভয়েই বিবাহিতা। তাঁহার দুইটি ছেলেও হইয়াছিল, কিন্তু শৈশবেই মারা যায়। ১৮৯১ সালে পরেশনাথের পত্নীবিয়োগ ঘটে। সহধর্মিণীর শোক তিনি খুব ধীরভাবে সহ্য করেন।

পরেশনাথ শেষ জীবন পর্যন্তও ব্যায়াম করিতেন। কিন্তু ব্যায়াম তাঁহার পক্ষে যথোপযুক্ত না হওয়াতে তাঁহার শরীর শেষ বয়সে অতিরিক্ত মোটা হইয়া পরিয়াছিল। উহাতে তাঁহার চলিতে ফিরিতে বেশ কষ্ট বোধ হইত। তিনি শেষ বয়সে স্কুলে যাতায়াতের সময়েও রাস্তায় বার তিনেক বিশ্রাম না করিয়া যাইতে পারিতেন না।

পরেশনাথ তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন। সেবার জন্মাষ্টমীর সময় তিনি অন্যান্য ছেলেদের সাথে তাঁহাদের স্কুলের সামনে মিছিল দেখিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। এই জায়গায় বরাবরই মিছিলের সময় খুব ভীড় হয়। সেবার একটি ছেলে বালক-সুলভ-চপলতাবশতঃ মিছিলের হাতীর গায়ে ঝালরটা একটু উঁচু করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতেই একটা পুলিশ ছেলেটির উপর রেগুলেশন লাঠি চালায়। অমনি পরেশনাথ, শ্যামাকান্ত, অধর ঘোষ সকলে দৌড়াইয়া আসেন। তাঁহারা প্রতিবাদ করাতে পুলিশের সাথে ঝগড়া হয়। অনেক রিজার্ভ মিলিটারী পুলিশ ঘটনা স্থলে আসিয়া

উপস্থিত হয়। শুনা যায়, কোন পক্ষই পশ্চাৎপদ না হওয়াতে ব্যাপারটা নাকি বড়ই সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল।

পরেশনাথ যখন কলিকাতা সিটি কলেজে এফ্. এ. পড়িতেন, সেই সময়ে কোন কারণে সর্বজনবরেণ্য দেশ-নায়ক স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের জেলের হুকুম হয়। ইহাতে ছাত্রসমাজ বিচলিত হইয়া উঠে এবং নানারূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময় কলিকাতা-বাসীরাও ঢাকার পরেশনাথের অনেকটা পরিচয় পাইয়াছিলেন।

একবার পরেশনাথ কলিকাতার এক জুতার দোকানে জুতা কিনিতে যান। এক জোড়া জুতা পছন্দ করিয়া দর জিজ্ঞাসা করেন। বিক্রেতার দর শুনিয়া পরেশ বাবু নিজেও একটা দর করেন। উত্তরে লোকটি বলেন—ও দামে একখানা জুতো নিতে পার। এই অপমানকর কথায় পরেশনাথ ভীষণ রাগিয়া যান। লোকটিও নরম না হইয়া আরো গরম হইয়া উঠে। তখন পরেশনাথ লোকটিকে হাতে কলমে বেশ একটু ভদ্রতা শিক্ষা দেন। ফলে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। স্থানীয় বহুলোক আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। একক পরেশনাথ ক্রুদ্ধ জনতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া বিজয় গর্বে ফিরিয়া আসেন।

পরেশনাথ ও শ্যামাকান্ত একবার রাজপুতনায় কসাইদের এক আখ্ড়ায় যাইয়া উপস্থিত হন এবং তাহাদের সহিত কুস্তি লড়িতে চাহেন। শ্যামাকান্ত একে একে সেই আখ্ড়ার সমস্ত

সাগ্‌রেদ ও তাহাদের ওস্তাদকে পরাস্ত করেন। শ্যামাকান্তের কুস্তির প্যাঁচ অপেক্ষা তাঁহার হাত দুইটিতে অসম্ভব রকম জোর ছিল। তিনি উহাদের এক একটার ঘাড়ে হাত দিয়া এমন ঘা মারিলেন যে এক ঘা'তেই সে বসিয়া পড়িল। তারপর এক-একটিকে ধরিয়া এক আছাড় মারেন, আর চিৎ করেন। পরিশেষে ওস্তাদও যখন হারিয়া গেল, তখন লোকগুলি একেবারে ক্ষেপিয়া পরেশনাথ ও শ্যামাকান্তকে মারিতে উঠিল। তখন তাঁহারা উহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া রাজপুতদের আর এক আখ্‌ড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বেশ আদর-যত্ন পাইলেন। কসাইরা বাঙালী লড়্‌নেওয়ালা দেখিয়া প্রথমে অবজ্ঞা ও টিট্‌কারি দিয়াছিল। কিন্তু বাঙলীর এই শক্তির পরিচয়ে তাহাদের আস্পর্ধা নষ্ট হইল।

পরেশনাথের জীবনের সাহসিকতার গল্প বলিয়া শেষ করা যায় না। ঢাকা শহরের অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার সাহসিকতার স্মৃতি মাখানো রহিয়াছে। তখনকার দিনে ঢাকা শহরের ভদ্রলোকের মান-সম্মান নিরাপদ ছিল না। গুণ্ডা-বদমায়েসদের জন্য সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথই সর্বপ্রথম ইহাদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং এইজন্য অনেক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শিক্ষিত ছেলেদের ভিতর তখন এমন একটা উৎসাহ আসিয়াছিল যে ডাঃ পি. কে. রায়ের মত লোকও অধর ঘোষের আখ্‌ড়ায় ল্যাঙট্‌ কষিয়া ডন-কুস্তি করিতেন। কিন্তু যাহাদের বাড়ীঘর ও মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য ইহারা বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইতেন,

তথা-কথিত সেই ভদ্র সমাজেরই অনেকে আবার শ্যামাকান্ত পরেশনাথকে 'ষণ্ডা-গুণ্ডা' নামে অভিহিত করিতে ত্রুটি করিত না। হায় রে দুর্ভাগা দেশ!

পরেশনাথ ১৯২৩ সালে আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে ঢাকা শহরেই মারা যান। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার দেহ নদীর পরপারে শুভাঢ্যা গ্রামে লইয়া যাওয়া হয় এবং জন্মভূমিতেই তাঁহার নশ্বর দেহের শেষ কার্য নিষ্পন্ন করা হয়।

ভীম ভবানী

কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটের সাহা-গণ বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ও বিশেষ পরিচিত। ইঁহাদের বংশের ৺উপেন্দ্রনাথ সাহা শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নয় ছেলে, মধ্যমটি বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর.ও কুস্তিগীর ভীম ভবানী।

ভীম ভবানীর আসল নাম ভবেন্দ্রনাথ সাহা। বাঙ্‌লা ১২৯৮ সালে ভবানীর জন্ম হয়। ছোটকালে ভবানী বড় রোগা ছিলেন। চৌদ্দ পনের বছর পর্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিয়া একেবারে শীর্ণকায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডি. গুপ্ত খাইয়া যদি বা একবার কিছুটা আরোগ্য লাভ করেন, আবার জ্বর আসিয়া ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে। ভবানীর মনে না আছে শান্তি, না আছে লেখাপড়ার উদ্যম উৎসাহ। শরীর সুস্থ না থাকিলে মনও ভাল থাকে না, সুস্থচিত্ত না হইলে লেখাপড়াও হয় না।

এই সময়ে দর্জিপাড়ায় (কলিকাতা) ক্ষেতু গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে মস্ত-বড় কুস্তির আখ্‌ড়া। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ হইতে ক্ষেতুবাবুর আখ্‌ড়ায় নামকরা পালোয়ানগণ কুস্তি লড়িতে আসিত। 'ক্ষেতুবাবুর আখ্‌ড়ার মাটি না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান তৎকালে ভারতবর্ষে ছিল না।' তখন ক্ষেতুবাবু বাঁচিয়া আছেন। ভবানী

ক্ষেতুবাবুর আখ্ড়ায় সাগ্রেদ (শিষ্য) হইয়া ভর্তি হইলেন। এই আখ্ড়ায় বাঙালীর গৌরব জগৎ-জয়ী কুস্তিগীর গোবরবাবুও এই সময়ে কুস্তি শিখিতেন। ভবানী আখ্ড়ায় ভর্তি হইয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আসিয়া উৎসাহ ও উত্তম সহকারে কুস্তি শিখিতে লাগিলেন।

শারীরিক শক্তিসঞ্চয় সাধনার বিষয়। তুচ্ছ বা অবহেলা করিলে এ সাধনার সিদ্ধি লাভ হয় না। আমাদের ছেলেদের সব চেয়ে বড় দোষ, তাহারা বুল্‌ডগের মত আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, সবই আছে, নাই শুধু বাঁচন-মরণ তুচ্ছ করিয়া জিনিসটাকে নাছোড়বান্দার মত জড়াইয়া ধরিয়া থাকার ক্ষমতা। জাতীয় চরিত্রের এই দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমরা সঙ্কল্প করি ত আরম্ভ করি না, আরম্ভ করি ত শেষ করি না'। শারীরিক ব্যায়াম-চর্চা সম্বন্ধে কথাটা হাড়ে হাড়ে সত্য। ছেলেরা দুইদিন ডন-কসরৎ করিয়া যদি শরীরের কোন ইতর-বিশেষ লক্ষ্য না করে তা' হইলেই অমনি একেবারে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া পড়ে ; কার কসরৎ কে করে ? যদি বা সৌভাগ্য-ক্রমে কাহারো শরীর একটু বাড়িতে থাকে, তবে ত কথাই নাই অমনি শাস্ত্র-বাক্য আওড়াইয়া স্বল্প-সন্তুষ্ট আশুতোষ হইয়া পড়ে। এই দোষটা যেমন করিয়া হোক শোধ্রাইয়া নিতে হইবে, নহিলে শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লাভ ত দূরের কথা, শরীরটা শুধু ম্যালেরিয়া আর ডিস্পেপ্সিয়ার আস্তানা হইয়া পড়িবে। অভিমানী ভবানীর

এই আঁকড়িয়া থাকার অভ্যাস ছিল বলিয়াই তিন চারি বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত শীর্ণ শরীরটাকে তিনি এরূপ রূপান্তরিত করিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-বীর রামমূর্তি পর্যন্ত উনিশ বছরের ছেলের এরূপ ভীমকান্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই কথাটাই বলিতেছি।

"ভবানীর যখন ১৯ বৎসর বয়স তখন সুপ্রসিদ্ধ রামমূর্তি কলিকাতায় খেলা (সার্কাস) দেখাইতে আসেন। ভবানী খেলা দেখিতে গিয়াছিছেন। তাঁবুতে তিল ধারণের স্থান নাই, ভবানী হতাশ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ কাহার করস্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন, এক অপূর্ব সুন্দর দিব্যকায় ব্যক্তি। তেমন বীরমূর্তি ভবানী আর কোন দিন দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আগন্তুক নির্নিমেষ নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়াছিলেন। কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি খেলা দেখিতে আসিয়াছ ?" তাহাই উদ্দেশ্য শুনিয়া আগন্তুক ভবানীর হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস ; আমি তোমাকে ভাল জায়গা দিতেছি।"

তাঁবুর মধ্যে যেখানে দলের লোকেরা বসিয়া—দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে একখানা আসন দেখাইয়া দিয়া তিনি ভবানীকে বলিলেন, "বস"।

বীরকায় পুরুষ স্মিত নেত্রে ভবানীর অপূর্ব অঙ্গ-সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার বয়স কত ?"

ভবানী বলিলেন—"উনিশ।"

"এই বয়সে তোমার এমন শরীর! আমি অনেক কুস্তিগীর পালোয়ান দেখিয়াছি। এমন অঙ্গ-সৌষ্ঠব, বীরোচিত অঙ্গ-গঠন ত দেখি নাই! তোমার মত যুবক পাইলে আমার সর্ববিদ্যা দিয়া পারদর্শী করিয়া তুলি।"

ভবানী তখনই জানিতে পারেন, ইনিই সুবিখ্যাত প্রফেসার রামমূর্তি। ভবানীও রামমূর্তির বীরপণা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার বীর-বপুর দিকে চাহিতে চাহিতে ভবানীর তরুণ হৃদয়ে যেন একটা তুফান বহিল। খেলা ভঙ্গে রামমূর্তি আবার সস্নেহে ভবানীকে আহ্বান করিলেন; আবার বলিলেন, "যদি তোমার মত যুবক পাইতাম—ইত্যাদি।"

ভবানী মাকে আর একথা বলিলেন না। বলিলে বিধবা জননী তো ছেলেকে এমন বিপদ-সঙ্কুল কাজে যাইতে দিবেন না। ভবানী রাতারাতি একদিন রামমূর্তির দলের সহিত পলাইয়া একেবারে রেঙ্গুনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর, যাভা প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রামমূর্তি যখন যবদ্বীপে তখন সেখানকার একজন ওলন্দাজ কুস্তিগীর তাঁহার সহিত কুস্তি লড়িতে চাহিলেন। রামমূর্তি তো অস্বীকার করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে নিজেরই অসম্মান। কেহ দঙ্গল বা প্রতিযোগিতায় কুস্তি লড়িতে চাহিলে কুস্তিগীর যিনি তাঁহাকে অন্ততঃ নিজের মান-মর্যাদার জন্যেও লড়িতে হয়। না-লড়াই বড় নিন্দার কথা! রামমূর্তি রাজী হইলেন। নিকটেই

ভবানী ছিলেন, তিনি বলিলেন—"ওস্তাদজী আমি আপনার সাগ্‌রেদ। উনি আগে আমার সঙ্গে লড়ুন, তারপর তো আপনি আছেনই!"

রামমূর্তি খুশী হইয়া বলিলেন, "বহুত আচ্ছা বেটা—লড়ো।"

তিন মিনিটে সাহেবের কুস্তির সাধ মিটিল। ভবানীর প্রথম প্রতিযোগিতাই সফল হইল।

কিন্তু রামমূর্তির দলে ভবানীর বেশীদিন থাকা পোষাইল না। ভবানী বাড়ী ফিরিলেন।

ভবানী বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। প্রফেসার কে, বসাকের সার্কাস তখন নাম-করা, সমস্ত এসিয়াখণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ভবানী ইহাদের দলে গিয়া পড়িলেন। তখন হইতে ভবানী স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে খেলা দেখাইবার সুযোগ পাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন।

সাংহাইতে একজন আমেরিকান পালোয়ান ভবানীকে কুস্তিতে আহ্বান করে। বাজী ১,০০০ ডলার। লোকটা হারিয়া যায়, এবং ১,০০০ ডলার ঘাট্‌তি দিয়া মুখ কালো করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু লোকটা প্রতিশোধ লইবার জন্য ভবানীকে নিহত করিবার চেষ্টা করে। ভবানী স্থানীয় কনসালকে (Consul) জানাইলেন। কনসালের চেষ্টায় ভবানীর জীবন রক্ষা হয়। কনসাল ভবানীর শক্তিপরীক্ষার জন্য বলিলেন, আমি মোটর চালাইব, ভবানী যদি গাড়ী থামাইতে পারেন, গাড়ী তাহার। ভবানীর চেষ্টা সফল হইল, তিনি নূতন মিনার্ভা গাড়ীখানা পুরস্কার পাইলেন। ভবানী দুইখানা

মোটর টানিয়া রাখিতে পারিতেন। একবার তিনখানা রাখিয়াছিলেন। সে ঘটনা পরে বলিতেছি।

ভবানী ৫ মণ ওজনের বারবেল অল্প আয়াসেই ভাঁজিয়া দেখাইতেন। সিমেণ্টের পিপের উপর ৫।৭ জন লোক বসাইয়া পিপের ধার দাঁত দিয়া উঠাইয়া শূন্যে ঘুরাইতেন। বুকের উপর চল্লিশ মণ পাথর চাপাইয়া বিশ পঁচিশটি লোককে বসিয়া খেয়াল খাম্বাজ গাহিবার অবসর দিতেন। সর্ব শরীর লোহার শিকলে আবদ্ধ করিয়া পলকের মধ্যে মট্‌মট্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। ভবানীর বুকের ও উরুর উপর দিয়া একই সময়ে দুইখানা গরুর গাড়ী পঞ্চাশজন লোক লইয়া চলিয়া যাইত, ভবানী পাষাণমূর্তির মত পড়িয়া থাকিতেন।

জাপান-সম্রাট্‌ মিকাডো মহোদয় ভবানীর শক্তির পরিচয় পাইয়া একবার তাঁহাকে একখানি সুবর্ণ-পদক ও ৭৫০৲ টাকা পুরস্কার দেন।

এইরূপে সমগ্র প্রাচ্যখণ্ড বিজয় করিয়া বাঙালীর মুকুট-মণি ভবানী গৌরবোজ্জ্বল কিরীট পরিয়া দেশের মাটিতে পা দিলেন। চারিদিকে বঙ্গবীরের জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

একবার ভরতপুরের মহারাজ ভবানীকে তিনখানা মোটব ধরিয়া থামাইতে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। ভবানী এ পর্যন্ত দুইখানা মোটরই থামাইয়া আসিয়াছেন, তিনখানা মোটর আবার কি ভাবে থামাইবেন! "মহারাজ বলিয়াছেন,—এইবার বুঝিব বাঙালী কেমন বীর! ভবানী কহিলেন,—মহারাজ,

আয়োজন করুন।” মহারাজ নিজে, রেসিডেন্ট (Resident) ও মন্ত্রী তিনজনে তিনখানা মোটর চাপিয়া বসিলেন। ভবানী গাড়ীগুলির পিছনে মোটা দড়ি বাঁধিয়া দুই হাতে দুইটি ধরিলেন, আর একটি কোমরে বাঁধিলেন; তারপর বলিলেন, Go—চালাও। তিনজনেই সমানে ষ্টার্ট দিলেন। স্পীডোমীটারে দেখা গেল ইঞ্জিন পূরাদমে চলিতেছে, কিন্তু গাড়ী এক ইঞ্চিও নড়িল না। পিছনের চাকা শূন্যে উঠিয়া খরর্ খরর্ শব্দ করিতে লাগিল। মহারাজ গাড়ী হইতে নামিয়া বাঙালী বীর-যুবকের কর-মর্দন করিলেন।

একবার মুর্শিদাবাদের নবাবের হাতীশালে একটা বুনো হাতী আনা হয়। হাতীটা লম্বায় ৯ ফুট সাত ইঞ্চি, ওজনও সাধারণ হাতীর চেয়ে বেশী। নবাব সাহেবের ইচ্ছা এই হাতীটা ভবানী বুকের উপর নিয়া চালাইয়া নিতে পারেন কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন! হাতী বুকের উপর দিয়া চালাইয়া লইবার ক্ষমতায় ভবানীর গুরু রামমূর্তি। রামমূর্তিও পোষা সার্কাসের হাতী ছাড়া এ পর্যন্ত অন্য হাতী বুকের উপর লন নাই! ভবানীও এ পর্যন্ত অন্য হাতী লইবার চেষ্টা করেন নাই। নবাব সাহেবের সন্তুষ্টি বিধানার্থ ভবানী জানাইলেন, তিনি বুকের উপর হাতী চালাইতে প্রস্তুত আছেন। সার্কাসের হাতী সাধারণতঃ অনাহার ও অর্ধাহারে দুর্বল ও শীর্ণ থাকে, কিন্তু এমন বন্য পশু বুকে তুলিবার দুরাশা কেউ কখনও করে নাই। ভবানী যখন সেই বন্য হাতীটাকে বুকের উপর চালাইয়া দিয়া অক্ষত ও সুস্থদেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন হাজার

কণ্ঠে ভবানীর জয়ধ্বনি উঠিল ও করতালি পড়িয়া গেল। বাঙ্‌লার লাটসাহেব নিজেও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।

ভবানী ১২০ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শাল, আলোয়ান, আংটি, মোটর গাড়ী, নগদ টাকাও যথেষ্ট পাইয়াছিলেন।

একবার কলিকাতা স্বদেশী মেলায় ভবানী তাহার অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি সকলেই সেই মেলায় উপস্থিত ছিলেন। ভবানীর খেলা দেখিয়া রসরাজ অমৃতলাল নাকি বলিয়াছিলেন, "মহাভারতের ভীম এমনি একজন বীর ছিলেন। তুমি দেখিতেছি কলিকালের ভীম। আজ হইতে আর তুমি শুধু ভবানী নহ, তুমি ভীম ভবানী।"

সেই হইতে ভবেন্দ্রনাথ ভীম-ভবানী নামেই পরিচিত হইলেন। পশ্চিমাঞ্চলে লোকে ভবানীকে ভীমমূর্তি বলিত।

ভবানী ৩১ বৎসর বয়সে ১৩২৯ সালে মারা যান। তিনি বিবাহ করেন নাই। নিজে খুব সাদাসিধা ভাবে চলিতেন, বাবুগিরি বিলাসিতা মোটেই তাঁহার ছিল না।

ভবানী মৃত্যুর পূর্বে আগাসীর সার্কাসে সাপ্তাহিক দেড়শত টাকা বেতনে খেলা দেখাইতেন।

প্রাতে ২০০ বাদামের সরবৎ, এক ছটাক গাওয়া ঘি; মধ্যাহ্নে সাধারণ ভাতডাল; অপরাহ্ণে ২৲ বা ২॥০ টাকার ফল ও ৫০টি বাদামের সরবৎ ও এক সের মাংস; রাত্রে আধসের আটার রুটি ও তিন পোয়া মাংস—ইহাই ছিল ভীম ভবানীর দৈনন্দিন আহার।

গোবর

ইংরেজী ১৮৯৪ সালের ১৩ই মার্চ কলিকাতার মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটে এক পালোয়ান-গোষ্ঠীতে বাঙ্‌লার জগৎ-খ্যাত কুস্তগীর গোবরবাবু জন্মগ্রহণ করেন। গোবরবাবু জন্মের সময় এত মোটা ছিলেন যে ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, ছেলে বাঁচিবে না।

গোবরবাবুর ভাল নাম শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ। ইহারা দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতায় বাস করিতেছেন এবং শিবু গুহের পরিবার বলিয়া বিখ্যাত।

গোবরবাবুর কুস্তি-কৌশল তাঁহার বংশের অবদান। তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ মহাশয় অদ্বিতীয় কুস্তিগীর ছিলেন। ইনিই আমাদের বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম সমস্ত ভারতবর্ষে কুস্তিতে নাম করেন। শুনা যায়, কুস্তিবিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ সেকালে ভারতবর্ষে কমই ছিল। অম্বুবাবু নিজে খুব নামকরা ধনী ছিলেন, কুস্তির চর্চা ও উৎসাহের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। এই লক্ষপতি কুস্তিগীর কুস্তি শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে খরচ করিয়াছেন। তিনি সৌখীন ছিলেন, ব্যবসায় হিসাবে বা অর্থোপার্জনের জন্য কুস্তি লড়িতেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত বাঙ্‌লায় কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দেশময় এই ব্যায়াম-

চর্চাটা ছড়াইয়া দিয়া দুর্বল বাঙালীকে সতেজ ও সজীব করিয়া তোলা।

অম্বুবাবু মারা যাওয়ার পর তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহ মহাশয় পিতার নাম ও যশ অর্জনে সমর্থ হন, এবং ইনিও একজন ভারত-বিখ্যাত কুস্তিগীর হইয়া উঠেন। ক্ষেতুবাবু গোবরবাবুর জ্যেঠা মহাশয়। কলিকাতায় ক্ষেতুবাবুর আখ্ড়া সমস্ত বাঙ্লা ও পশ্চিমাঞ্চলের নামজাদা পালোয়ানদের একটা বড় আড্ডা ছিল।

ক্ষেতুবাবু যখন মারা যান, গোবর বাবুর বয়স মোটে তের বছর। সে সময় এমন কেহ উপযুক্ত ছিল না যে এই বংশের অবদানটির মর্যাদা ও সম্মান রাখিতে পারে। দুই পুরুষের এই কুস্তির চর্চাটা এক রকম উঠিয়া যাইবার যোগার হইয়া উঠে। তখন গোবরবাবুর বাবা রামচরণ গুহ মহাশয় পুত্রকে ব্যায়াম-চর্চা করাইতে শুরু করিলেন। ইনিও যৌবনে কুস্তি করিতেন এবং এদিকে, তাঁহারও অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে ল্যাঙট্ কষিয়া তিনি গোবরবাবুকে দাঁও-প্যাচ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। বড় বড় নামজাদা পালোয়ানদের দেখাইবার জন্য গোবরবাবুর সঙ্গে লইয়া পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। গোবরবাবুকে কুস্তি শিখাইবার জন্য গামা, কাল্লু, রাহমনী প্রভৃতি নামকরা পালোয়ানগণ নিযুক্ত ছিলেন। ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যহ চারি টাকা হইতে ছয় টাকা বেতন পাইতেন।

রামচরণবাবুর পুত্রের জন্য যেমন একদিকে শরীর-চর্চার কার্যকরী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তেমনি আবার পুত্রকে উৎসাহিত করিবার

গোবর

জন্য এবং উচ্চ ভাব-প্রবাহ জীবনে বহমান রাখিবার জন্য সর্বদা বলিতেন, —"বাঙালী যে দুর্বল ইহা মিথ্যা, তোমার জীবন দিয়া একথা প্রমাণ করিয়া জোর গলায় বলিতে হইবে। ভগবান্ তোমাকে এমন একটা শরীর যখন নেহাৎই দিয়াছেন, ভাল করিয়া সাধনা কর। ফলাফল ভগবান্ জানে, উহা তাঁহারই হাতে।" আজ যে গোবরবাবুর দিগ্বিজয়ী বেশ দেখিয়া আমাদের বুক গর্বে ফুলিয়া উঠে তাহার মূলে তাঁহার পিতার একান্ত উৎসাহ ও অর্থব্যয়। বুড়ো বয়সেও তিনি গোবর-বাবুকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, "তোমার দাদামহাশয়ের সঙ্কল্পের কথা যেন সব সময় তোমার স্মরণ থাকে। মনে রাখিও, তাঁহার অতৃপ্ত আত্মার কাতর দৃষ্টি তোমার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে।"

গোবরবাবু ছোটকালে বাড়ীতেই পড়িতেন। তারপর মেট্রোপলিটান স্কুলে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর স্কুল) ভর্তি হন। এখান হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর কিছুকাল ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করেন এবং আমেরিকা হইতে পত্র-ব্যবহারে (by correspondence) সমাজ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন।

১৯১০ সালের মার্চমাসে গোবরবাবু প্রথম য়ুরোপ যান। তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতর বছর। এই সময়ে ইনি মাত্র তিন মাস বিদেশে থাকিয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেই গোবরবাবুর বিবাহ হয়। গোবরবাবুর ছেলেরাও বাপের কাছে বেশ কুস্তি-কসরৎ শিখিয়াছে।

১৯১২ সালে আবার গোবরবাবু য়ুরোপ যাত্রা করেন। এবারকার দিগ্বিজয়ের বিবরণ খানিকটা একখানি বিলাতী কাগজের তর্জমা ("প্রবাসী") হইতে তুলিয়া দিলাম।—

"Gobar the 18-stone Boy-Wrestler from India who wears a collar, 160 lbs. in weight"—ভারতবর্ষের বালক-পালোয়ান গোবর—ওজন তিন মণ। সে গলায় দুই মণ ওজনের একটি হাসুলি পরে।

"হ্যাম্পস্টেডে একটি বাড়ীর পেছনে একটি বাগানে আমি গোবরকে প্রথম দেখি। ঘাসের উপর একটি মাদুর বিছান, তার উপর সেই অদ্ভুত বিশালকায় প্রায় তাঁরই মত প্রকাণ্ড ইংরেজ পালোয়ান ফিল লেনের সঙ্গে কুস্তি লড়্ছিল। ফিল খুব হাঁপাচ্ছিল, গোবরকে বেদম কর্‌তে খুব চেষ্টা কর্‌ছিল; কিন্তু গোবর কোনক্রমেই বেদম হচ্ছিল না।

"গোবর সবে মাত্র কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেছে; কিন্তু কি ভীষণ যুবা! দৈত্যের মত তাঁর দেহ! সে একটা প্রকাণ্ড বালকের মত—চোখ উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। জীবনটা তার কাছে আনন্দ ও সৌন্দর্যে ভরা, সে এখন বলবান্ এবং বলশালিতার গৌরব খুব অনুভব করে।

"গোবর বিলাতী খাদ্য ছোঁয় না। সব তার চাকররা রেঁধে দেয়। সে খুব পক্ষীমাংস ও মাখন খায়। তা ছাড়া বাদাম চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরী এক রকম উপাদেয় জিনিস (সরবৎ) তার ভারী প্রিয়। সে মদ স্পর্শও করে না। সিগারেট মাসে হয়ত এক আধবার টানে।

"তার দু' জোড়া মুগুর আছে। এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন পঁচিশ সের। আর এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন এক মণ দশ সের।"

১৯১৩ সালের ২৭শে আগষ্ট তিনি স্কটল্যণ্ডবাসী ভারী ওজনদার পালোয়ান জিমি ক্যাম্বেলকে হারাইয়া Scottish championship (স্কটীশ চ্যাম্পিয়ানশিপ) পান। ঐ বছরই ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি এডিনবরার ওলিম্পিক অডিটোরিয়মে অজেয় জিমি এসেনকে (The Unconquerable Jimmy Essen) পরাজিত করিয়া Championship of the United Kingdom (চ্যাম্পিয়ানশিপ অব দি ইউনাইটেড কিংডম) লাভ করেন। ফরাসী-বীর মুষ্টিযুদ্ধ-নিপুণ কার্পেন্টিয়ার ছাড়া এত অল্প বয়সে এ সম্মান আর কেহ পায় নাই। তারপর গোবরবাবু প্যারী যান। বিখ্যাত 'নোভো সার্ক টুর্ণামেণ্টে' (Novo cirque tournament) সেখানে য়ুরোপের অনেক বড় বড় পালোয়ানকে হঠাইয়া দেন। ইহাদের ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কুস্তি হয় জর্মন দিগ্বিজয়ী কার্ল শাপ্টের সহিত (Karl Saft the German Champion)। সে কুস্তিটায় তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট কাল ধরিয়া লড়িতে হইয়াছিল। এখানে গোবরবাবুর কুস্তি চর্চার সহযোগী (training partner) ছিলেন বিস্কো (Zbysco), ডিক্ শিকত (Dick Shikat) ও জর্জেস্ হ্যাকেন-স্মিট (Georges Hacken-shmidt)। বিদেশের বিজয়মালা গলায় পরিয়া ১৯১৫ সালে গোবরবাবু স্বদেশের কোলে ফিরিয়া আসিলেন।

গোবরবাবু ১৯১৬ সালে জুলাই মাসে কোলাপুরের মহারাজ সর্বশ্রেষ্ঠ পলোয়ান 'গণ্‌পু'র সহিত লড়িবার জন্য সেখানে যান মহারাজা নিজেও একজন ভাল কুস্তিগীর ছিলেন। গোবরবাবু 'গণ্‌পু'র কুস্তি হইল পুরা দুই ঘণ্টা। কুস্তিটা সমান-সম হইয়াছিল।

তারপর ১৯২০ সালে ভারতের বিখ্যাত পালোয়ান বড় গাম সহিত গোবরবাবুর কুস্তি ঠিক হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুস্তির অ দিন আগে গোবরবাবু ডিপথেরিয়ায় মরণাপন্ন হইয়া পড়েন এ কুস্তি বন্ধ হইয়া যায়।

এই সালেরই অক্টোবর মাসে গোবরবাবু তাহার উপযুক্ত শি বনমালীকে লইয়া মার্কিন দেশে যান। গোবরবাবু সেখানে নামজাদা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়িয়াছেন। ১৯২১ সা ২৪শে আগষ্ট সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে অ্যাড্ স্যাণ্টেলকে (A Santel) হারাইয়া লাইট্ হেভী ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ানশিপ (Lig Heavy-Weight Championship of the World) লা জগৎ-খ্যাতি প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া গোবরবাবু ষ্ট্র্যাংলার (*Strangler Lewis*), যুডিস্কো ব্রাদার্স (Zudisco Brother জো ষ্টেচার (*Joe Stechare*) প্রমুখ মার্কিন মল্লবীরদের সা কুস্তি লড়িয়াছেন। সুবিখ্যাত ষ্ট্র্যাংলার লুই তখন পৃথি চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। গোবরের সঙ্গে তাঁর দংগল হ'লে প্রথম গোবর জিতেন, দ্বিতীয়বার লুই, কিন্তু তৃতীয়বার লুই 'ফাউল' ক গোবরকে ফেলে দেন। প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিচারক লুইকে বিজ

ঘোষণা করেন। গোবরই একমাত্র ভারতীয় পলোয়ান যিনি সরকারি ভাবে আমেরিকায় গৃহীত হন।

এইরূপ ছয় বছর আমেরিকায় ঘুরিয়া ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গোবরবাবু ভারতে ফিরিলেন। তাঁহার ইচ্ছা দেশে থাকিয়া পিতামহের সঙ্কল্পটা কাজে পরিণত করা। ইনি বলেন—"আমার ইচ্ছা যাহাতে দেশের শিক্ষিত লোকের ভিতর ব্যায়াম-চর্চা ঢুকে তাহার চেষ্টা করা। যাহাতে সুস্থ ও সবলদেহ ছেলেরা সমাজ ও দেশের কাজ করিতে পারে তাহারই যোগ্য করিয়া তোলা।"

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় গোবরের সঙ্গে গামার (ছোট) কুস্তি হয়। উহাতে গামা জয় লাভ করেন।

অনেকের ধারণা কুস্তি-কসরৎ করিতে হইলেই পেশ্‌তা-বাদাম আর কালিয়া-কোর্মা চাই, নচেৎ হিতে বিপরীত ঘটে। গোবরবাবু কিন্তু ভাতের ভক্ত। তিনি বলেন—সাধারণ খাদ্যেই আমাদিগকে স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে পারে যদি সংযমী হওয়া যায়, আর রীতিমত আমাদের দেশী ব্যায়ামগুলি সুষ্ঠুভাবে করা যায়।

যাহারা বাঙালীর দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য বাঙ্‌লার জলবায়ুকে দোষ দেন তাহাদিগকে গোবরবাবুর এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিতে বলি.—"পৃথিবীর এত দেশ তো বেড়িয়ে এলুম, কিন্তু বাংলা দেশে আমার শরীর যেমন ভালো থাকে এমন আর কোথাও নয়।"

ইনি আরো বলেন—সাহেবেরা যেমন massage (মেসেজ্ করেন, আমাদেরও ডলন-মলন শরীর-চর্চার জন্য বিশেষ আবশ্যক উহাতে শরীরের খুব দ্রুত উন্নতি হয়।

বর্তমানে গোবর-বাবু কলিকাতা নিজের ব্যায়ামাগারে শরীর চা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গোবরবাবুর শরীরের ওজন ৩ মণ ২০ সের (যখন আঠা বছর বয়স)।

তাঁহার শরীরের পরিমাণ এইরূপ—দৈর্ঘ্য ৬ ফিট্ ১ ইঞ্চি, বু ৪৮—৫০ ইঞ্চি, গলা ১৮৷৷০ ইঞ্চি, কোমর ৪২ ইঞ্চি, জানু ৩০ ইঞ্চি

ভারতীয় অতিকায় কুস্তিগীরদের একটি ক্রমিক তালিকা গা এইরূপে নির্দেশ করেন, তাহাতে গোবরবাবু নবম স্থান অধিক করেন।—(১) গামা। (২) ইমাম বক্স (রুস্তম-ই-হিন্দ্) (৩) (ক) গুঙ্গা। (খ) হামিদা। (গ) ছোট গাম (ঘ) ইয়াকাপ্ বুলার। (৪) আতুখান। (৫) দোলা মুহম্ম (৬) আলা বক্স। (৭) সাহাবুদ্দিন। (৮) গণ্ডা সিং (৯) গোবরবাবু (পৃথিবীর লাইট-হেভি ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ন)

ভারতবর্ষে গোবরবাবুই একমাত্র পালোয়ান যিনি পাশ্চা কুস্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ একাধারে ডাক্তার ও ব্যায়াম-বীর। তাঁহার পুরো নাম কাপ্তেন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত আই. এম্. এস্ (অবসর-প্রাপ্ত)। কাপ্তেন খেতাবটি তাঁহার ডাক্তারির কৃতিত্বের নিদর্শন। ফণীন্দ্রকৃষ্ণই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়ামচর্চা প্রচলন করেন এবং কেবল মাত্র ব্যায়াম-চর্চা দ্বারা নানারূপ জটিল ব্যাধি আরোগ্য করিবার বিবিধ নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন।

১৮৮৩ সালে কলিকাতা শহরে ফণীন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺গোঁসাইদাস গুপ্ত। ইনি অতি ক্ষীণদেহ ও দুর্বল ছিলেন। বাঙ্‌লার স্বনামখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ফণীন্দ্রকৃষ্ণের মাতামহ ছিলেন।

হুগলী জেলার বালীতে ইঁহাদের পৈতৃক নিবাস ছিল। কিন্তু এক শত বছর যাবৎ কলিকাতা শহরেই বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতায়ই ফণীন্দ্রকৃষ্ণের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এখানেই তাঁহার শিক্ষার শেষ হয়। তিনি প্রথমে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি হইলেন। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে

কিছুকাল পড়েন। তারপর সেখান হইতে আবার সেন্ট্রাল কলেজে গিয়া ভর্তি হইলেন। কলেজের সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ১৯০৮ সালে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ হইয়া বাহির হন।

তিনি শরীর ভাল করিবার জন্য অম্বুবাবুর আখ্ড়ায় ভর্তি হইলেন। ফণীন্দ্রকৃষ্ণ সাত বছর অম্বুবাবুর আখ্ড়ায় কুস্তি লড়েন। প্রত্যহ ভোরে কুস্তি লড়িতেন এবং বিকালবেলা ডাম্বেল প্রভৃতি ব্যায়ামাদি করিতেন। অম্বুবাবুর মৃত্যুর পর ফণীন্দ্রকৃষ্ণ নিজের বাড়ীর নিকটেই একটি আখ্ড়া খোলেন। এখানে বাঙালী ও পশ্চিমদেশীয় যুবকদিগকে কুস্তি শিখাইতেন।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয় কলিকাতাতেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করেন। এই সময়ে তিি কিছুকাল জাহাজের সার্জন হইয়া চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলং প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া আসেন। ১৯১৪ সালে যখন য়ুরোপের মহাসম আরম্ভ হয় তখন তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে ঢুকেন। এ সময়ে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও ডাঃ সর্বাধিকারীর চেষ্টায় বেঙ্গ এম্বুল্যান্স কোর নামক একটি বাঙালী স্বেচ্ছা-সেবক-দল যুদ্ধের জ গঠিত হয়; ইহার গঠন কার্যে ফণীন্দ্রকৃষ্ণ যথেষ্ট সহায়তা করে এবং ইহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দিয়া ইহাদের সহকা নায়ক (Adjutant) হইয়া মেসোপটেমিয়া যান। এই দলে সকলেই শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের সন্তান। ইহারা ফণীন্দ্রকৃষে

অধিনায়কতায় খুব সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন। যখন এই দল ভাঙ্গিয়া যায়, তখন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ঈজিপ্ট (মিশর), প্যালেষ্টাইন, তুর্কী, সিরিয়া, আর্মেনিয়া, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন।

ভারতীয় সেনা-দলে কাজ করিবার সময় তিনি ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেণ্টের নামজাদা পালোয়ানদিগকে কুস্তি শিখাইতেন। মাঝে মাঝে প্রধান সেনাপতির আদেশে কুস্তির প্রতিযোগিতায় বিচারক থাকিতেন।

প্রায় নয় বৎসর তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতাতেই থাকেন। তাঁহার উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম-প্রণালী শিক্ষা দিয়া বাঙ্‌লার দুর্বল ও শ্রী-হীন তরুণদিগকে বলিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সাধনাই তাঁহার জীবনের কাজ ছিল। তিনি ব্যায়াম-শিক্ষার ভিতর দিয়া চিকিৎসা করিয়া অনেক কঠিন রোগীরও আরোগ্য বিধান করিয়াছেন। তিনি এইভাবে বাঙালী অবাঙালী বহু রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতায় যখন কুস্তির প্রতিযোগিতা হইত অনেক সময় ফণীন্দ্রকৃষ্ণই বিচারক থাকিতেন এবং তাঁহার বিচার সকল পক্ষই মাথা পাতিয়া নিতেন। ১৯২৩-২৪ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে যে নিখিল-ভারত কুস্তির প্রতিযোগিতা (All India Championship Wrestling Tournament) হয়, তাহাতে ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ও মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেব মধ্যস্থ ছিলেন।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ দুই প্যাকেট খেলিবার তাস এক সঙ্গে একটানে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিতেন।

ইনি চব্বিশ বছরের সময় বিবাহ করেন। ফণীন্দ্রকৃষ্ণের শরীরের পরিমাণ এইরূপ :—ওজন—২ মণ ১৫ সের। উচ্চতা—৫ ফিট্ ৫ ইঞ্চি। বুক—৪৭ ইঞ্চি (স্ফীত ৪৯½ পাঃ ইঞ্চি)। বাহু (Bicep)—১৮ ইঞ্চি (৫ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতায় ১৮ ইঞ্চি বাহু আর কাহারো নাই (World's record)। পুরোবাহু—১৪ ইঞ্চি। উরু—২৬½ পাঃ ইঞ্চি। কোমর—৩৩ ইঞ্চি।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ অতিরিক্ত আহারের বিরোধী ছিলেন।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ একদল সবল ও কর্মঠ বাঙালী যুবক গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শরীর-চর্চাক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

রাজেন ঠাকুরতা

কলিকাতার সিটি কলেজ ও য়ুনিভারসিটি 'ল' কলেজ হোষ্টেলের ভূতপূর্ব ব্যায়াম-শিক্ষক প্রফেসার রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতার নাম এদেশে সুপরিচিত। একদিন রাজেনবাবু ক্ষোভে ব্যায়াম-বীর রামমূর্তিকে গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার বাঙ্‌লা থেকে অন্ততঃ একশো রামমূর্তি বের করে দেবো।" তাঁহার সেই শপথবাণী সত্য হইয়াছে। এমন ডজন কয়েক রামমূর্তি ইহারই মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

১২৯০ সালে মাঘ মাসে বরিশাল শহরে মামাবাড়ীতে রাজেন বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার বাবার নাম ৺বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা। ইহাদের বাড়ী বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামে। রাজেন বাবুর বাবা খুব বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন।

রাজেন বাবুর বয়স যখন মোটে আড়াই বছর তখন তাঁহার মা-বাপ উভয়েই মারা যান। তখন হইতেই রাজেনবাবু মামাবাড়ীতে প্রতিপালিত।

ছোটকালে রাজেনবাবুর লিভার খারাপ ছিল, প্রায়ই অসুখে ভুগিতেন। একবার নিউমোনিয়ায় একেবারে মড়ার মত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রাজেনবাবুর বয়স যখন মোটে ছয় বছর তখনই তিনি বেশ ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন। তের চৌদ্দ বছর পর্যন্ত তিনি

ঘোড়দৌড় অভ্যাস করেন। বার বছর বয়স হইতেই ডন-কস্‌রৎ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার খুব জেদ ছিল—রাগও ছিল ভয়ানক। যখন যাহা করিবেন বলিয়া ধরিয়া বসিতেন, তাহা নাছোর-বান্দা হইয়া ধরিয়া থাকিতেন, শেষ করিয়া তবে ছাড়িতেন। তাঁহার ডর-ভয় মোটেই ছিল না। একবার বাড়ীতে কি লইয়া রাগারাগি হয়, তিনি বাড়ী ছাড়িয়া পালাইলেন। তারপর এক সার্কাস-দলে গিয়া নাম লিখাইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বার বছর এবং বরিশাল বি. এম্. স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন। তখন হইতেই তাঁহার পড়াশুনা ক্ষান্ত হয়।

এই সময় বরিশাল বি. এম্. স্কুলে ব্যায়াম মাষ্টার ছিলেন—মল্লবীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য শিষ্য সূর্যকান্ত গুহ ঠাকুরতা। সূর্যবাবু রাজেন বাবুকে বড় ভালবাসিতেন। তখন রাজেনবাবুর বয়স চৌদ্দ বছর। সূর্যবাবু রাজেনবাবুকে জোর করিয়া ব্যায়ামে প্রবৃত্ত করান। রাজেনবাবু সার্কাসের কস্‌রৎ শিখিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসেন। সূর্যবাবু যত্ন করিয়া তাঁহাকে জিমনাষ্টিকের সব রকম কৌশল (figure) শিখাইয়া দিলেন। রাজেনবাবুর শারীরিক গঠন স্বভাবতঃই বেশ ভাল ছিল। ব্যায়াম-চর্চার ফলে তাঁহার শরীরটি দিন দিন বড়ই স্থন্দর হইয়া উঠিল।

রাজেনবাবুর মামা কিন্তু ব্যায়াম-ট্যায়াম দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। রাজেনবাবু যে ব্যায়াম করেন, ইহা বাসায় জানিতে পারিলে আর রক্ষা ছিল না। বাধ্য হইয়া রাজেনবাবুকে লুকাইয়া পালাইয়া ব্যায়াম করিতে হইত। তিনি অনেক মারপিট খাইয়াও

কোন দিন ব্যায়াম ছাড়েন নাই। এতখানি ঐকান্তিকতা ছিল বলিয়া আজ তিনি এত বড় হইতে পারিয়াছেন।

সূর্যবাবুর নিকট তিন জন শিখ সৈন্য ডন-কস্রত্ করিতে যাইত। উহাদের মধ্যে একজন পাঁচ মণ ওজনের একটি পাথর বুকে লইয়া তাহার উপর আবার মানুষ উঠাইত। দেখিয়া রাজেন বাবুর তরুণ হৃদয়ের রক্তবিন্দুগুলি মাতিয়া নাচিয়া উঠিল। ভাবিলেন, শিখে যাহা করিতে পারে বাঙালীও তাহা অবশ্য পারিবে। তিনি সূর্যবাবুকে বলিলেন, আমি বুকে পাথর লইব। সূর্যবাবু তো কিছুতেই দিবেন না। রাজেনবাবু কোন আপত্তিই শুনিলেন না। বাধ্য হইয়া সূর্যবাবু অনুমতি দিলেন। রাজেনবাবু পাঁচ মণ ওজনের পাথরখানি বুকে তুলিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। এই সফলতায় তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিল এবং মনের জোরও বাড়িয়া গেল। তিনি আরও ভারী পাথর উঠাইতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ চেষ্টা করিয়া তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই নয় দশ মণ ওজনের পাথর বুকে লইতে সক্ষম হইলেন। তখন ১৯১০ সাল।

১৯১০ সালে বরিশাল শহরে দরবার দিন উপলক্ষে শারীর-চর্চা লইয়া বি.এম্. কলেজ ও জেলা স্কুলের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়।

তিনি সেদিন সকলের সামনে বুকের উপর রোলার, তার উপর পাঁচ মণ ওজনের একখানি পাথর এবং তার উপর চারিজন লোক লইলেন। উপস্থিত দর্শকগণ বিস্ময়ে ও আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রাজেনবাবুর খুব প্রশংসা করিলেন।

ইহার পর হইতে রাজেনবাবুর মনের জোর খুব বাড়িয়া যায়। পর বৎসর দরবার দিনে তিনি একটন (২৭॥ মণ) ওজনের রোলার বুকে লন। প্রত্যেক বারেই বরিশাল কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় তাঁহাকে মেডেল ও অন্যান্য পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন। বরিশালে তিনি পরিশেষে আড়াই টন (৬৮ মণ ৩০ সের) ওজনের রোলার বুকে লইতেন।

১৯১৪ সালে রাজেনবাবু একটি সখের সার্কাস দল (amateur circus party) গঠিত করেন। ১৯১৬ সালে তিনি ভজহরি দে নামক একজন সঙ্গীকে লইয়া ঢাকায় আর্মানীটোলা বায়স্কোপ হলে প্রথম টিকিট করিয়া সার্কাস দেখান। ইহাতে তিনি রোলার বুকে লন, শিকল ছিঁড়েন এবং ভজহরি ৪৫ মিনিট মাটির নীচে থাকেন। ঐ বছর ঢাকাতেই ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নীর বিদায় উপলক্ষে তিনি মোটরগাড়ী থামান।

ছয় মাস ঢাকায় থাকিয়া মুক্তাগাছার (মৈমনসিংহ) রাজা জগৎকিশোর আচার্য বাহাদুরের বাড়ীতে মোটর থামান এবং রোলার বুকে লন।

এই সময়ে রাজেনবাবু নারায়ণগঞ্জে সাড়ে তিন টন ওজনের একটি রোলার বুকে লইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা যান। সেখানে কার্লেকার সার্কাসে তিনি চারি টন (১১০ মণ) ওজনের রোলার বুকে লন।

ইহার পর বৎসর তিনি অলডার্স সার্কাসে হাতী লওয়া অভ্যাস করেন। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার ধুম গ্রামে রায় বাহাদুর

গোলকচন্দ্রের বাড়ীতে একটা হাতীকে এক দিনের ভিতর শিক্ষিত করিয়া সেটাকে বুকে লন।

১৯১৯ সালে প্রফেসার রামমূর্তি খেলা দেখাইতে বরিশাল যান। রাজেনবাবু সেই সময়ে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, রামমূর্তির সবগুলি খেলাই তিনি দেখাইবেন। রামমূর্তি রাজী হন এবং রাজেন-বাবুকে তাহার খেলার জিনিসপত্র দিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু দুই তিন দিন পরে তিনি রাজেনবাবুকে তাহার জিনিসপত্র (instruments) দিতে নারাজ হন। ইহাতে রাজেনবাবু খুব চটিয়া যান এবং তাঁহাকে সগর্বে বলিয়া দিলেন—তিনি জীবনে অন্ততঃ একশত রামমূর্তি গড়িয়া যাইবেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রাজেনবাবু একটি গরুর গাড়ী বুকে লইবার সময় হঠাৎ তাঁহার বুকে একটা আঘাত পান এবং কিছুদিন বিশ্রাম লইবার জন্য কলিকাতায় যান।

একদিন কলিকাতায় সিটি কলেজের অধ্যাপক ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সতীশচন্দ্র চাটার্জির সহিত তাঁহার দেখা হয়। সতীশবাবু পূর্বে বরিশাল কলেজে প্রোফেসার ছিলেন এবং তখন হইতেই রাজেনবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয়। সতীশবাবু রাজেনবাবুকে পাইয়া বলিলেন, "রাজেন, তোমাকে সিটি কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক (Physical Instructor) হইতে হইবে।" রাজেনবাবুর ছোটকাল হইতে চাকুরী করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সতীশবাবু বলিলেন— "রাজেন, শুধু নিজের শরীর বড় করিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে আরো দশজনের শরীরও ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বাঙালী শরীর হিসাবে বড় দুর্বল। বাঙালীকে সবল করিয়া তুলিবার ভার তোমাদিগকেই নিতে হইবে।” তখন তাঁহার মনে হইল রামমূর্তির কাছে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা। ভাবিলেন, এই সুযোগ। স্কুল-কলেজের ভিতর দিয়াই তো বাঙালীকে সবল করিবার মন্ত্র প্রচার করিতে হইবে।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে তিনি চাকুরী গ্রহণ করিলেন। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি কলিকাতায় শরীর-চর্চা প্রদর্শন করেন। এই উপলক্ষে তিনি মোটর থামান, রোলার বুকে লন এবং বারের (Bar) নানারকম কস্‌রৎ দেখান।

রাজেনবাবু ইহারই মধ্যে একদল শক্তিশালী তরুণের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ইহারা দেশের গৌরবস্বরূপ। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান্ গোপালনারায়ণ চৌধুরী তিনখানা মোটর থামাইতে পারেন, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী দুই টন রোলার বুকে লন, শ্রীমান্ বিষ্ণুচরণ ঘোষ muscle controlএ (মাংসপেশীর স্বেচ্ছানুরূপ সঞ্চালনে) পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, আয়রণ ম্যান শ্রীনীরদ কুমার সরকার বহুবিধ শক্তি-পূর্ণ ও শিহরণমূলক কৌশল আবিষ্কার ও প্রদর্শন করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। যোগব্যায়ামে ইনি বিশেষজ্ঞ। ব্যায়াম ও যোগব্যায়ামের পুস্তক ও চার্ট প্রণেতা এবং বহু ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত motor accidentএ (দূর হইতে force দিয়া মোটর খানিকে গায়ের উপর দিয়া চালাইয়া লইতে দেওয়া) এবং motor brushingএ (দুই ধারে দুই খানি মোটর push করিয়া ঠেলিয়া দেওয়া) খুব কৃতিত্ব

দেখাইয়াছেন, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমান্ গোপাল চৌধুরী, শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র রায়, শ্রীমান্ সত্যপদ ভট্টাচার্য weight-liftingএ (ভার-উত্তোলন) এবং শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র সেন muscle-control bar-bending (লৌহদণ্ড ধনুকের ন্যায় নত করা) বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন।

রাজেনবাবু কলিকাতায় একটা নূতন উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙালীকে শরীরের দিক্ দিয়া সবল ও সমর্থ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য "All Bengal Physical Culture Association" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের গণ্যমান্য অনেকেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং যাঁহারা শরীর-চর্চায় বাঙলায় অগ্রণী সেই রাজেনবাবু, গোপালবাবু, কাপ্তেন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ, পুলিনবাবু প্রভৃতি ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

রাজেনবাবু ১৯২৫ সাল হইতে কলিকাতার "ল" কলেজের ছাত্রাবাস হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই উদ্যোগে সেখানে একটি চমৎকার ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজেনবাবু নিরামিষাশী ছিলেন। মাছমাংস তিনি বিশেষ পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, নিরামিষ আহারেই শরীর ভাল থাকে, অসুখ বিসুখও কম হয়। খাওয়ার বিষয়ে তিনি বিশেষ সংযমী ছিলেন—খুব অল্প আহার করিতেন। তিনি বলিতেন, সাধারণ বাঙালী যা খাদ্য খায় তাহাতেই শরীর বেশ ভাল হইতে পারে। পেস্তা-বাদাম মাংস-পোলাওর কোন দরকার পড়ে না। পোষা-

শরীর—যে শরীর সবল ও সুন্দর করিয়া তৈরী হয় শুধু লোক দেখানোর জন্য,—সে শরীর মোটেই তিনি পছন্দ করিতেন না। শরীর যদি সৎকাজেই না লাগিল সে শরীর থাকা না থাকায় কোন তফাৎ নাই। তিনি অনেক দিন হইতেই ছাত্রদের সহিত মিশিয়াছেন, ছাত্রদের ভাল-মন্দ কিসে হয় তিনি তাহা ভাল করিয়াই বুঝিতেন। তিনি বলিতেন—যে কোন ব্যায়াম নিয়মিত ভাবে করিতে পারিলেই শরীর ভাল হয়। সংযম-শিক্ষা ও ব্যায়াম-চর্চা পরস্পর একটি আর একটির উপর নির্ভর করে। শরীর-চর্চা হঠযোগেরই একটা অংশ। ইহাও সাধনার মত করিয়াই করিতে হয়।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে রাজেনবাবু গত ১৩৫২ সালে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

মহেন্দ্রনাথ

সার্কাস-বিখ্যাত মহেন্দ্রনাথের নাম বাঙালী ছেলে-বুড়া সকলের নিকটই পরিচিত। মহেন্দ্রনাথ নিজের জীবন-সাধনা দিয়া বাঙলা দেশে একটা নূতন উদ্যম ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছেন।

১২৮৫ সালে ২রা জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ...না-গ্রামে মহেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূরা নাম বাবু ...ন্দ্রনাথ দাশ মজুমদার। মহেন্দ্রনাথের পিতার নাম ৺ভগবানচন্দ্র দা... মজুমদার। ছোটকালে মহেন্দ্রনাথ বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পড়িতেন। যখন তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন সেই সময়ে তাঁহার পিতা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর অর্থাভাবে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনায় ক্ষান্ত হইতে হয়। তখন তিনি চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন এবং কিছুকাল ফৌজদারী আদালতে নকলনবিশের কাজ করেন। কিন্তু তিনি অন্য ধাতের মানুষ ছিলেন। কলম পেষা তাঁহার পোষাইল না। তিনি রঙ্গপুরে গেলেন—অন্য কোন কাজ পান কিনা। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও কোথাও দশ পনের টাকার চাকুরীও মিলিল না।

তখন তিনি ব্যায়াম-চর্চায় মন দিলেন, নানা জায়গায় ঘুরিয়া ব্যায়াম শিখিলেন। কিছুদিন ব্যায়ামের মাষ্টারিও করিলেন।

ইহার পর তিনি সুবিখ্যাত এবেল সাহেবের গ্রেট্ ইষ্টার্ণ সার্কাসে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মনির্ভরশীল স্বাধীনচিত্তটি বেশী দিন পরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিতে চাহিল না। কিছুদি এই সার্কাসে কাজ করিবার পর তিনি নিজেই একটি ক্ষুদ্র সার্কাস দ খুলিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহা বিখ্যাত 'রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের' বাল্যাবস্থা।

যে মহেন্দ্রনাথ একদিন আট দশ টাকার চাকুরীর জন্য মানুষে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়াছেন, তিনি স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় ব প্রচুর অর্থ, সম্মান, খ্যাতি সকলই পাইয়াছেন এবং স্বর্ণ পদকাদি শোভিত হইয়া জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

একদিন স্বর্গীয় পরেশনাথের সঙ্গে প্রোঃ রামমূর্তি দেখা করি আসিয়াছিলেন। কথায় কথায় রামমূর্তি একটু টিট্কারী ব য়া বলিয়াছিলেন—বাঙলা দেশে কিছুই নাই। শরীর চর্চার নূতন কিছু দেখানো বাঙালী বাবুর কাজ নয়। কথায় বলে—'সাজা বাজা কেশ, তিন বাংলা দেশ।' জাতির প্রতি ব্যঙ্গোক্তিতে অভিমানী পরেশনাথের শরীর জ্বলিয়া গেল। তিনি মহেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া প্রোঃ রামমূর্তির কথা শুনাইয়া বলিলেন,—মহেন্দ্র একটা নূতন কিছু খেল দেখি, যাতে বাঙালীর মানটা বজায় থাকে।

মহেন্দ্রনাথ পরেশনাথের আখড়ার মাটি গায়ে মাখিয়াছেন। তিনি পরেশনাথকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি সংকল্প করিলেন, একটা নূতন কিছু করিবেনই। রামমূর্তি তখন বুকে হাতী লইতেন। একদিন মহেন্দ্রনাথ রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একটি

বিপুলাকার লোহার রোলার তাঁহার নজরে পড়িল। অমনি তাঁহার খেয়াল চাপিল,—১৬২ মণ ওজনের এই লোহার রোলারটি বুকে তুলিয়া লইবেন। যেমনি সঙ্কল্প তেমনি কাজ। সেই রাত্রেই কয়েকজন সহকর্মীর সাহায্যে এই রোলারটি বুকে লইলেন এবং দিন কয়েকের মধ্যেই খেলা দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

মহেন্দ্রনাথের অন্যান্য খেলায়ও তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বুকের উপর বিশ মণ ওজনের একখানি পাথর তুলিয়া লন। সেই পাথরখানির উপরে একটি দণ্ডের মাথায় "রাধাচক্রে" ৪।৫ জন লোক কয়েক মিনিট ঘুরিতে থাকে। তারপর রাধাচক্রটি নামাইয়া লইলে তিনি নিজেই সেই পাথরখানি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠে।

মহেন্দ্রনাথ ভার-উত্তোলনেও অদ্বিতীয়। তিনি কতকগুলি লোহার গোলা লইয়া এই খেলা দেখান। এক মণ ওজনের একটি গোলা তিনি অনায়াসে চিবুকের উপর রাখিতে পারেন এবং যে কোন হাতে এই গোলাটি দশ বার হাত দূরে এবং চারি পাঁচ হাত ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিতে পারেন। পাঁচ মণ ওজনের গোলা দুই হাতে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া রাখিতে পারেন এবং মাথার উপর দিয়া চারি পাঁচ হাত দূরে পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করিতে পারেন।

মহেন্দ্রনাথের আর একটি খেলা মোটর টানিয়া রাখা। তিনি একযোগে পঁচিশ অশ্ব-শক্তির সমতুল্য দুইখানি মোটর টানিয়া রাখিতে পারেন, এক খানার তো কথাই নাই। মোটর গাড়ী

দুইখানা মোটা দড়ি দিয়া তাঁহার দুই হাতের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার পর তিনি ঠিকমত দাঁড়াইলেই মোটর দুইখানি দুইদিকে পূর্ণবেগে চালাইয়া দেওয়া হয়। মহেন্দ্রনাথের বাহুবলের

মহেন্দ্রনাথ

২৫ হইতে ৪০ ফিট লম্বা আর ১৫ হইতে ২১ ফিট উঁচু স্থান মোটর সহ লাফ দিয়া পার হইতেছেন

নিকট মোটরের গতিবেগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। 'মোটর জাম্প' (Motor Jump) মহেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নূতন খেলা। একখানি চলন্ত মোটর লইয়া অবলীলাক্রমে ২৫ ফিট্ হইতে ৪০ ফিট্ (দৈর্ঘ্যে)

জায়গা ৫ ফিট্ হইতে ২১ ফিট্ উচ্চে লাফ দিয়া পার হইয়া যান। ইহা তাঁহার অসামান্য সাহস ও ক্ষিপ্রতার যথেষ্ট পরিচয়। বস্তুতঃ এরূপ অমানুষিক ক্রীড়া এ পর্যন্ত জগতে আর কেহ খেলেন নাই।

ধনুর্বিদ্যায় মহেন্দ্রনাথ এ যুগের সব্যসাচী। তাঁহার 'শব্দভেদী বাণ' 'সপ্ততালভেদ' প্রভৃতি খেলা আমাদিগকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়া দিত। এই তীরের খেলা মহেন্দ্রনাথের নিজস্ব। তিনি একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাসের বলে এই খেলায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। একবার মান্দ্রাজের একটি লোক আসিয়া নানারকম তীরের খেলা দেখাইয়া সকলকে বিস্ময়ান্বিত করেন। মহেন্দ্রনাথ তাহাকে ওস্তাদ মানিয়া তাহার খেলা শিখিতে চান। কিন্তু ব্যবসায়ী সুচতুর মান্দ্রাজীটি টালবাহানা করিয়া তাহাকে শিখিবার সুযোগ দেন না। ইহাতে অভিমানী মহেন্দ্রনাথ বড়ই ক্ষুব্ধ হন এবং নিজেই ধনুক লইয়া অভ্যাস করিতে থাকেন। বর্তমান যুগের বাঙালী একলব্যের এই সাধনা ব্যর্থ হইল না। কালে তিনি একজন সুনিপুণ ধনুর্বিদ হইয়া উঠিলেন। ঐকান্তিক একাগ্রতা ও অধ্যবসায় মহেন্দ্রনাথের অতিমাত্রায় ছিল বলিয়াই তিনি আচার্যের বিনা সাহায্যে এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন বিদ্যার অনুশীলনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন।

একবার মহেন্দ্রনাথ জামালগঞ্জ ও পার্বতীপুর স্টেশনের মধ্যস্থানে কোন এক মেলায় খেলা দেখাইতেছিলেন। ঐ মেলার নিকটই একটি নদী। কোন জমিদারের মাহুত একটা প্রকাণ্ড পাগলা হাতীকে রোজ তাঁহার তাবুর সামনে দিয়া নদীতে লইয়া যাইত। যাইবার সময়

হাতীটা তাঁবুর অনেক অনিষ্ট করিত। মহেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলেও মাহুতটা তাহাতে কান দিত না। একদিন বাঁধা দেওয়ায় পাগলা হাতীটা মহেন্দ্রনাথকে হঠাৎ আক্রমণ করে। মহেন্দ্র পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার লোক নন। তিনি একটা মোটা বাঁশ লইয়া হাতীটাকে বেদম পিটাতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় আধঘণ্টা মার খাইয়া হাতীটা চীৎকার করিয়া পালাইয়া যায়।

মহেন্দ্রনাথ নিজের-হাতে-গড়া মানুষ। তিনি বলিতেন—বাঙালী যুবকদের ভিতর মনের বল, একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস আনা চাই। তবেই তাহারা বলিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

খাদ্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—আমরা সাধারণ বাঙালীরা যাহা খাইয়া থাকি তাহা নিয়মিত ভাবে বিচারপূর্বক গ্রহণ করিলে ও নিয়মিত পরিশ্রম করিলে ইহাতে যথেষ্ট শক্তি বাড়িতে পারে। দেশী ডন-কস্‌রৎ—মুগুরভাঁজা, বুকডন প্রভৃতিই ভাল। কিন্তু মিতাচারী ও মিতাহারী না হইলে শক্তি-সঞ্চয় অসম্ভব।

তিনি আরো বলিতেন,—যুবকগণ যদি পঁচিশ বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং সমগ্র জীবন সংযমে পরিচালিত করেন, তবে শরীরে অমানুষিক বল পাইবেন।

বড়ই দুঃখের কথা, ১৩৩৭ সালে মহেন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা জয়যুক্ত হউক। বাঙ্‌লায় আবার দলে দলে ছেলেদের ভিতর সংহত-ভাবে ব্যায়াম-চর্চা প্রচলিত হউক। তাহারা বজ্রকঠোর শক্ত-সমর্থ মানুষ হইয়া দাঁড়াক।

শ্যামসুন্দর গোস্বামী

যে পুণ্যতীর্থ শান্তিপুর ভক্ত বৈষ্ণবদের পূত প্রেমধারায় বহু শতাব্দী ধরিয়া প্লবমান রহিয়াছে, সেই শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশে ব্যায়ামাচার্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী মহাশয়ের জন্ম হয়। ক্ষত্রোচিত সাধনা, ভাবগ্রাহী বাঙালীকে কর্মঠ মানুষ করিবার সাধনা। বস্তুতঃ সুসংহত ব্যায়াম-প্রণালী সাহায্যে বাঙালীকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিবার পথ করিয়া লইতে হইবে। এই পথে যাঁহারা দীপবর্ত্তিকা হস্তে জাতিকে পথ প্রদর্শন করিয়া চালিত করিতেছেন তাঁহাদের অন্যতম শ্যামসুন্দর।

ইংরেজী ১৮৯১ সালের ১১ ই অক্টোবর (১৩৯৮ সন ২৫ শে আশ্বিন) রবিবার বীরাষ্টমী তিথিতে শ্যামসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা "গোস্বামী ইন্‌ষ্টিটিউটের" প্রতিষ্ঠাতা বাবু যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী।

যতীন্দ্রমোহন শরীর-চর্চার একজন উদ্যোগী পুরুষ। স্বর্গীয় পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন, আমাদের জাতির ক্রমশঃ অপচীয়মান শারীরিক শক্তি যতীন্দ্রমোহনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রদিগকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শিক্ষাদ্বারা সুগঠিত করিয়া তুলিবেন। তাঁহার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে। তাই আজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর গোস্বামী শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে ভার-রক্ষণে (weight-supporting)

তিনি জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। (—Sad Neglect of Physical Culture Among the Indians—ইংরাজীর মর্মানুবাদ)। বাল্যকালে শ্যামসুন্দর মোটেই বলবান্ ছিলেন না। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং তিনি রোগা ছিলেন। তবে ছোটকাল হইতেই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ছিল। আজ যে তিনি ভারতের নানাস্থানে শরীর ও মনের উৎকর্ষবিধায়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা একমাত্র তাঁহার পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল।

বর্তমানে তিনি নিয়মিত ভাবে Liberty, Athletic India, Welfare, Modern Journal, Amrita Bazar Patrika, Sportsman, Tennis & Sports, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রবাসী, বসুমতী, বঙ্গলক্ষ্মী, শান্তিপুর প্রভৃতি পত্রিকায় শরীর-চর্চা বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

অতুলনীয় শক্তি-অর্জনে, বজ্রবৎ শরীর-গঠনে, দুর্জয় মনন-শক্তির সংবর্ধনে পিতৃদত্ত উপদেশ ও আদেশই শ্যামসুন্দরকে সর্বাপেক্ষা বেশি সহায়তা করিয়াছে। নবজীবনের প্রারম্ভেই তিনি তদীয় পিতৃদেব কর্তৃক 'মানুষ হওয়ার' মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

যে শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা তিনি শরীর-চর্চাকে এক নবরূপ দিয়াছেন তাহা তদীয় তথ্য-নির্ণয়ের অক্লান্ত চেষ্টা, অবিচলিত অধ্যবসায়, গভীর গবেষণা, তুলনামূলক অধ্যয়ন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সিদ্ধান্তগুলির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও পরীক্ষা, ধীর পর্যবেক্ষণ, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

এবং সর্বোপরি তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতা-প্রসূত। তিনি ব্যায়াম-চর্চা দ্বারা যেরূপ শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য বর্ধন করিয়া থাকেন, আবার উহারই সাহায্যে রোগ নিরাকরণও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত তাঁহার ব্যায়াম-চর্চা দুই ভাগেই বিভক্ত—(১) গঠনমূলক ও (২) আরোগ্যমূলক। তিনি বর্তমানে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করিতেছেন—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য সংগঠন, আয়ুবর্ধন, জড়ানিরাকরণ, ব্যাধিনিবারণ, বলবৃদ্ধি, মেধাবৃদ্ধি, শুক্রজয়, সুন্দর সবল অপত্যোৎপাদনের উপায় ইত্যাদি।

মহীশূরের মহারাজা, নরসিংহগড়ের মহারাজা কিষেণ প্রসাদ বাহাদুর প্রমুখ ভারতের বিখ্যাত রাজন্যবর্গের সমক্ষে শ্যামসুন্দর অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বহুমূল্য উপহার লাভ করিয়াছেন। পিঠাপুরমের (মাদ্রাজ) মহারাজার 'হীরক পদক' তিনি লাভ করিয়াছেন। হায়দরাবাদের নিজাম ক্লাবে তিনি Iron man নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নেপালের মহারাজা পিঠাপুরমের মহারাজা, রামনাদের রাজা, নবাব সালার জঙ্গ বাহাদুর, পারলাকিমেদির রাজকুমার প্রভৃতির ভূতপূর্ব ব্যায়াম-শিক্ষক (Physical Director) ছিলেন। বাঙালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা বৈ কি।

শ্যামসুন্দর ৬ টন ওজন (প্রায় ১৬২ মণ) অথবা দুইটি হাতী বুকের উপর লইতে পারেন; আধ টন ওজন গলার উপর লইয়া থাকেন; ইনি শারীরিক পেশীসমূহ যথেচ্ছ সঞ্চালন ও সঙ্কোচন করিতে পারেন—পেশীসমূহ সঙ্কোচনদ্বারা এতটা শক্ত করিতে

পারেন যে অত্যন্ত সবল হস্তে তীক্ষ্ণ চিম্‌টাদ্বারা বিদ্ধ করিলেও তিনি অক্ষত ও অচঞ্চল রহেন ; পেটের পেশী সঙ্কোচন করিলে জোয়ান মুষ্টিযোদ্ধা তাঁহাকে ঘুষি মারিয়া মোটেও কাবু করিতে পারেন না ; তাঁহার গলায় মোটা দড়ি বা লোহার শিকল বাঁধিয়া আটজন লোক টানাটানি করিলেও তাঁহাকে ফাঁসি দিতে পারিবে না। শ্যামসুন্দর এক প্যাকেট তাস (২৫ খানা) একটানে দুই ভাগ, চারি ভাগ, আট ভাগ ও পরিশেষে ষোল ভাগে ছিন্ন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত লোহার শিকল ভাঙা, লোহার মোটা শিক বাঁকা করা, দাঁত চুল ও অঙ্গুলী দ্বারা গুরুভার উত্তোলন করা—তাঁহার উল্লেখ-যোগ্য কসরৎ। শ্যামসুন্দরের উদ্ভাবিত বিনা অস্ত্রপ্রয়োগে বস্তি (Colon Lavage) বা অন্ত্রধৌতি (Alimentary Canal Washing) দ্বারা শরীরকে সুস্থ ও নিরাময় রাখা যায়। বিনা অস্ত্রে গুহ্যদ্বার দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করাইয়া এবং উহা দ্বারা অভ্যন্তর ভাগ ধৌত করিয়া পুনরায় সেই জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। শ্যামসুন্দর বাবুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমান্ দীনবন্ধু প্রামাণিক বহু স্থানে ইহার প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় দীনবন্ধু অপরিণত বয়সে স্টকহল্‌মে (সুইডেন) *পরলোক গমন করেন। ইনি* শ্যামসুন্দর বাবুর সঙ্গে অনেকদিন সেখানে ছিলেন। তাহার ভাই শ্রীগৌরসুন্দর গোস্বামী ধনুর্বিদ্যায় ক্ষিপ্রহস্ত ও শ্রীনিতাইসুন্দর গোস্বামী পেশী-নিয়ন্ত্রণে সুদক্ষ।

শ্যামসুন্দরবাবু তাঁহার এই ব্যায়াম-প্রণালীদ্বারা যক্ষ্মা, অজীর্ণ, অম্ল, চক্ষুরোগ, বাত এবং বহুবিধ কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন।

তাঁহার উদ্ভাবিত ব্যায়াম-প্রণালী সাহায্যে বৃদ্ধও তরুণ যুবা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

যাহাতে বাঙালী জাতি স্বাস্থ্য ও শক্তির অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে—ইহাই শ্যামসুন্দর বাবুর সকল কর্ম-প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে শান্তিপুরের ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহাতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তজ্জন্য ইনি জীবনপণ করিয়া ব্রতী হইয়াছেন। ইতিমধ্যে অনেক ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতী তাঁহার ব্যায়ামশালা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর বাবু ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় এই কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর বাবু যেমন একদিকে শরীরচর্চা প্রদর্শন করিয়া দেশের বুকে প্রেরণা যোগাইতেছেন, অপরদিকে আবার গভীর গবেষণা দ্বারা জীবনের এই অতি-প্রয়োজনীয় উপকরণটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমেরিকার (Naturopathy Association) তাঁহার এই শরীর সম্বন্ধীয় গবেষণা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বিদেশে যাইয়াও শরীর চর্চার প্রচার করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর বাবু কয়েক বৎসর যাবৎ সুইডেনের রাজধানী স্টকহল্‌ম নগরে যোগব্যায়াম শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত আছেন। তথাকার অধিবাসীরা আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট এই শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

শ্যামসুন্দরের এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হইয়া উঠুক। বাঙালী জাতি আবার গর্বোন্নত শিরে স্বাস্থ্য ও শক্তি লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াক্।

অসি-খেলায় বাঙালী

ননীলাল বসু

লাঠি যদিও বা তার ক্ষীণ প্রাণশক্তি লইয়া বাঁচিয়া আছে, অসির সে দর্পিত ঝনৎকার আর বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল চাহনি বাঙ্‌লাদেশে বড়-একটা দেখা যায় না। ক্ষাত্র-শক্তির মূর্ত প্রতীক অসি আজ নির্বাসিত, তার আশ্রয় মরচে-ধরা জীর্ণ খাপ। এমন একটা দরবারী বীরোদ্দীপক খেলা দেশে ঠাঁই পায় না।

ননীলাল বসু আমাদের দেশে অসি-শিক্ষার চর্চা ও প্রচার করিয়াছেন। ননীবাবু ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ কলিকাতায় অসিখেলায় একটা সাড়া আনেন।

ননীলাল ১৮৮৭ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বেণীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে ননীলাল পাঠশালায় পড়েন। এখানে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়া পাশ করেন। তৎপর মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। ননীলালের বয়স তখন দশ এগার বছর। এই সময়ে কালীঘাটে "সন্তান সম্প্রদায়" নামে একটি সেবক দল ছিল। ইহাদের কাজ ছিল গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা, অসুস্থ-পীড়িতদের আপদে-বিপদে সেবাশুশ্রূষা ও সহায়তা করা। ননীলাল এই দলে ভর্তি হইয়া বিপন্ন দীন দরিদ্রের সেবা করিতেন।

এই সময়ে কলিকাতা মনোহরপুকুর বাগানে শিবনারায়ণ পরমহংস বাস করিতেন। ননীলাল পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান এবং সেই বাগানেই লাঠি খেলার একটি আড্ডা স্থাপন করেন। একদিন যখন ননীলাল খেলিতেছিলেন, পরমহংসদেব তাঁহার খেলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তলোয়ার খেলার কতকগুলি নূতন বিষয় শিখাইয়া দেন। এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যে পরমহংসদেব ননীলালকে একজন পাকা তলোয়ার খেলোয়ার করিয়া তুলেন। ননীলাল তলোয়ারের যে সমস্ত খেলা দেখান সে সমস্তই এই মহাপুরুষের শিক্ষার ফল।

ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বানার্জি

বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়া পত্তন করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহারই ভাই জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরীর-চর্চায় নূতন প্রেরণা দিয়াছেন। শরীর-চর্চায় উৎসাহদাতারূপে বাংলা দেশে বীরকান্তি ক্যাপ্টেন বানার্জির নাম অমর হইয়া রহিবে!

ক্যাপ্টেন বানার্জি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৮৮০ সালে বিলাতে যাইয়া আইন অধ্যয়ন করেন। ১৭৯৬ সালে কলিকাতা ভলান্টিয়ার রাইফেল আর্মিতে তিনি সাধারণ সৈনিক হইয়া যোগদান করেন। দুই বছর পরে তিনি কালার সার্জেণ্ট (colour sergeant) পদে উন্নীত হন। ১৯১২ সালে যখন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজের সেনাদল পরিচালনা করিয়াছিলেন! ১৯১৭ সালে তিনি রেজিমেণ্টাল কোয়ার্টার-মাষ্টার (Regimental Quarter-master হন এবং বঙ্গবাহিনী (বেঙ্গল রেজিমেণ্ট) গঠনে সাহায্য করার জন্য ১৯১৯ সালে "ওয়ার ব্যাজ্" প্রাপ্ত হন। ১৯২০ সালে তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন।

বাল্যকাল হইতে ক্যাপ্টেন বানার্জি শরীর-চর্চায় অনুরাগী ছিলেন। যেখানে যখন কোন খেলাধূলা বা ব্যায়াম-চর্চা হইত, সেখানেই

তাঁহার উপস্থিতি লক্ষিত হইত। তাঁহার দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ ছিল। অমন বীরকান্তি বাংলাদেশে কমই দেখা গিয়াছে। তাঁহার বলশালিতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহারই উদ্যোগে 'বেঙ্গল ফিজিকাল কালচার এসোসিয়াসন' গঠিত হয় এবং তিনি উহার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সোয়া লাখ টাকা শরীর-চর্চার জন্য এই সমিতিকে দান করিবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। বাঙালীর দুর্বল স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে আর নাই। জিতেন্দ্রনাথ চিরকুমার ছিলেন।

১৯৩৫ সালে এই বীরচরিত্র বঙ্গ-মনীষী ৭৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

বাংলার মুষ্টিযোদ্ধা

বলাই চাটুয্যে

বলাই চাটুয্যের নাম শুনে নাই এমন ছেলে এদেশে বিরল. বলাই খেলোয়ার দলের মুকুটমণি—এমন খেলা নাই যাহাতে বলাই নাম না করিয়াছেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, দৌড়াদৌড়ি, বক্সিং (মুষ্টিযুদ্ধ) যাহা কিছু বল, সবটাতেই বলাই ওস্তাদের সেরা. এমন সব-খেলায়-ওস্তাদি অনেক দেশেই মিলে কম। বিদেশী খেলা খেলিয়া বিদেশীর সাথে টক্কর দিয়া বাঙালীর শরীর-চর্চার নজীরখানি বলাই-ই তো জগতের বীরেন্দ্র-সভায় পেশ করিয়া বাঙালীর মান রাখিয়াছেন।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী চুঁচূড়ার নিকটস্থ ডুমুরদহ গ্রামে বলাই জন্মগ্রহণ করেন—১৯০০ সালের মার্চ, বাংলা ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার। বলাইর বাবার নাম ৺রামলাল চট্টোপাধ্যায়। বলাই বাপের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র।

বর্ধমান জেলার বাদলা গ্রামে বলাইর মামা-বাড়ী। সেইখানে বলাইর লেখাপড়া স্থুরু হয়। বলাই ১৯১০ সাল পর্যন্ত বাদলা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েন।

১৯১১ সালে বলাই কলিকাতা স্কটিশ চার্চেস্ স্কুলে আসিয়া ভর্তি হন এবং এই স্কুল হইতেই ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন।

১৯১৬ সাল হইতেই বলাই সমস্ত রকম খেলায় সমানভাবে যোগ দিতে সুরু করেন। এই বছরই হিন্দুস্কুলের সহিত একটি ফাইনেল খেলায় বলাই যোগ দেন। খেলার প্রতিযোগিতায় বলাই এই প্রথম যোগদান করেন। ইহার পরের বছর নিখিল ভারত স্কুল প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন এবং একটি শিল্ড ও মেডেল পুরস্কার লাভ করেন। বলাইর জীবনে এই প্রথম পুরস্কার পাওয়া। সেই বছরই তাহার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে কলেজ টিমে লওয়া হয়।

১৯১৮ সালেও তিনি স্কুলের চ্যাম্পিয়নশিপ্ এবং Calcutta Athletic Junior Sport Championship পান। কালীঘাটের Sportএ মিঃ ডাফ্রেকে long jumpএ হঠাইয়া দেন। সেই হইতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বলাই প্রতিযোগিতায় high jump, hurdles প্রভৃতিতে championship পাইয়া আসিতেছেন।

১৯১৭ সালে তিনি Y. M. C. A. তে প্রথম ফুটবল খেলেন—কলিকাতা টিমের (Calcutta Team) বিপক্ষে। ১৯১৮ সালে এরিয়ান ক্লাবে (Aryan Club) ভর্তি হন এবং সকল অবস্থানেই (position) খেলেন।

ইহার পর হইতে বলাই মোহন বাগান ক্লাবে সেণ্টার হাফেই সাধারণতঃ খেলিয়াছেন। গত কয় বছর যাবৎ কলিকাতায় ভারতীয় বনাম য়ুরোপীয় এবং সিভিল বনাম মিলিটারী যত খেলা হইয়াছে, প্রত্যেক খেলায়ই তিনি যোগদান করিয়াছেন। বলাই ভারতবর্ষের সর্বত্র—বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, সিমলা, মন্দ্রাজ, রেঙ্গুন প্রভৃতি বড় বড়

শহরে—এমন কি সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূরদেশেও খেলিতে গিয়াছেন। সব জায়গায়ই অজস্র প্রশংসা পাইয়াছেন।

১৯১৭ সাল হইতে তিনি হকি ও ক্রিকেট খেলা অতি সুখ্যাতির সহিত [illegible]। ক্রিকেট খেলায় bowling ও batting দুইটাতেই তিনি ওস্তাদ।

বলাই ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সিটি এ্যাথ্‌লেটিক ক্লাবের (City Athletic Club) যে কোন অবস্থানে (position) হকি খেলিতেন। ১৯২১ সালে মোহনবাগ ক্লাবে তিনি ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেট বল, ভলি বল, দৌড়ান, লাফান (high and long jump), hurdle, বহুদূরব্যাপী দৌড় প্রভৃতি সমস্ত ক্রীড়াতেই সমভাবে যোগদান করেন। বাঙ্‌লাদেশে বলাই-ই প্রথম ১৯ মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রবর্তন ও প্রচলন করেন।

বলাইর দৌড়ের তালিকা :—

১০ মাইল—১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ; $\frac{১}{২}$ আধ মাইল—২ মিনিট ৭ সেকেণ্ড ; ৪৪০ গজ—৫২$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ড ; ২২০ গজ—২০$\frac{২}{৫}$ সেকেণ্ড ; ১০০ গজ—১০$\frac{৩}{৫}$ সেকেণ্ড।

Hurdle raceএর (বেড়া ডিঙ্গাইয়া দৌড) তালিকা :—

২২০ গজ—২৭$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ড। ১২০ গজ—১৬$\frac{২}{৫}$ সেকেণ্ড।

হাই জাম্প (High Jump) :—৫ ফিট্ ৯ ইঞ্চি।

লং জাম্প (Long Jump) :—২১ ফিট্ ৫ ইঞ্চি।

কলিকাতা ব্যতীত দার্জিলিং, কার্শিয়াং, পুণা, বোম্বাই, দিল্লী, সিমলা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বলাই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

আত্মরক্ষার জন্য বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধের মত সহজ ও অব্যর্থ উপায় আর নাই। বিলাতী খেলার মধ্যে এমন বীরোচিত খেলা কমই আছে। মিলটন কিউব্‌স ভারতের নামকরা "মধ্য ওজনের বাহাদুর" (Middle Weight Champion)। বলাই প্রথম কয়েকদিন তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন (১৯২৫ সাল ১৭ই এপ্রিল)। তারপর বড় বড় বক্সারদের খেলা দেখিয়া নিজে নিজেই শিখেন। শিক্ষালাভের কিছুদিন পরেই কলিকাতা এম্পায়ার থিয়েটারে একটি য়ুরোপীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় বক্সিং খেলেন এবং তাহাকে হারাইয়া দেন। বলাইর এই অভাবিত জয়লাভে সকলেই বিস্মিত হন এবং বলাইর জয়-জয়কার পড়িয়া যায়।

ইহার পর ১৯২৫ সালে ২৫শে নবেম্বর কলিকাতা Y.M.C.A.র উদ্যোগে বাঙ্‌লার লাট সাহেব লর্ড লিটনের উপস্থিতিতে বলাই বক্সিং খেলেন। ১৯২৬ সালে ১৬ই জানুয়ারী শনিবার ভবানীপুর কিং কার্নিভালে বলাই সার্জেণ্ট ডে'র সহিত বক্সিং খেলেন। সার্জেণ্ট ডে ভারতের নাম-করা মুষ্টিযোদ্ধা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সার্জেণ্ট ডে বলাইর সহিত খেলার ঘুষি সহ্য করিতে না পারায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। বলাই এ পর্যন্ত যে কয়টি বক্সিং প্রতিযোগিতায় খেলিয়াছেন প্রায় সব কয়টিতেই তিনি জয়ী হইয়াছেন।

বলাই বলেন—"বক্সিং শিক্ষা করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। বক্সিং করিতে হইলে চোখের দৃষ্টির প্রখরতা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা এবং তৎপরতা একান্ত দরকার। মার খাইয়াও যাহাতে কিছুতে হটিতে না হয় এমনতর ধৈর্য্য ও সহনশীলতা চাই।"

বলাই আমাদের মত সাধারণ ভারত-তরকারীতেই পুষ্ট। তিনি নিরামিষ খাদ্যের খুব ভক্ত। দধি ও মিষ্টি তাঁহার বড়ই প্রিয়। বলাই কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য স্পর্শও করেন না। এমন কি চা, পান, সিগারেট প্রভৃতি কিছুই খান না।

ছেলে-বুড়া সকলকে শরীর-চর্চা দ্বারা উন্নত ও বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই বলাইর সঙ্কল্প। এই উদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বলাই বলেন—ব্যায়াম কর্‌লেই শরীরটা সবচেয়ে ভাল থাকে—বিশেষতঃ যারা নিরামিষ খান তাদের। শরীর সুস্থ ও সবল কর্‌তে হলে সকলের আগে তামাক পান চুরুট ছাড়্‌তে হবে, বায়স্কোপ থিয়েটার যাওয়া বন্ধ কর্‌তে হবে। ছেলেদের পক্ষে যে কোন খেলাই ভাল, কিন্তু খেলাধূলার পর আড্ডাবাজী করাটাই ভয়ঙ্কর খারাপ। এমন ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করবে যে তোমার জন্যে জীবন দিতে পারে।

জগৎশীল

বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁহারা খ্যাতি ও যশ অর্জন করিয়া আত্মরক্ষার ক্ষত্রোচিত এই মহাস্ত্রটিকে বাঙ্‌লাদেশে প্রচলনের

বলাই চাটুজ্জে

জগৎ শীল

সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বলাই চাটুয্যে ও জগৎশীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাইর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে জগৎকান্ত শীলের কথা বলিব। জগৎকান্ত সাধারণ্যে "জগা শীল" বলিয়াই পরিচিত।

ইংরেজী ১৯০৬ সালে কলিকাতায় জগৎকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিখ্যাত ব্যবসায়ী বঙ্কুবিহারী শীল। জগৎকান্ত কলিকাতাস্থ বহুবাজার স্কুলে লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া মান্দ্রাজের Physical Training College হইতে (শরীর চর্চা বিদ্যালয়) প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট লইয়া আসেন। ইনি ভারতের বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মিলটন্ কিউব্‌সের নিকট মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতায় "জুনিয়ার" বা ছোট দলের মধ্যে জগৎকান্ত চৌকস (all-round) খেলোয়ার বলিয়া নাম করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে ইনি মোহনবাগান ক্লাবে ভর্তি হইয়া ঐ বছর হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ফুটবল খেলিয়াছিলেন। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েসনের উদ্যোগে ১৯২৪ সালের ১০ মাইল দৌড় ও ১৯২৬ সালের ৫ মাইল দৌড়-প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস, সাঁতার, দৌড়ঝাঁপ প্রভৃতি সকল খেলাতেই জগৎকান্ত সমভাবে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে যশস্বী করিয়া তুলিয়াছে।

১৯২৫ সালে কলিকাতায় প্রথম কিং কার্ণিভালে তিনি বক্সিংএ নামেন। ইহার পর হইতে কলিকাতার খুব কম প্রতিযোগিতাই তাঁহার বাদ পড়িয়াছে। মাদ্রাজে অবস্থান কালে তিনি পনরটি বক্সিং প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি অধিকাংশেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত তিনি ৩৫টি বক্সিং যুদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৫টিতে তিনিই জিতিয়াছেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা পার্ল সিনেমাতে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা উইল ক্যার্টারকে এবং ১৯৩০ সালে আমেরিকান সার্কাসে প্রসিদ্ধ ফিলিপীয় বক্সার রস কার্লোকে পরাজিত করেন।

জগৎকান্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের Playground Physical Director ছিলেন এবং অন্যান্য অনেক শরীর-চর্চা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। School of Physical Culture এর তিনি অবৈতনিক পরিচালক। প্রতিষ্ঠানটি শরীর-চর্চায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ জগৎকান্তের শিক্ষাদানপ্রণালী বড়ই চিত্তাকর্ষক ও জনপ্রিয়। তিনিই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ভারতীয় স্কুলসমূহের মধ্যে বক্সিং প্রতিযোগিতা প্রচলিত করিয়াছেন। জগৎকান্ত মধ্যমাকৃতি ও ক্ষিপ্রকৌশলী তরুণ যুবা। তাঁহার এই প্রচেষ্টা বাঙালী ছেলেদের কঙ্কালসার দেহগুলিকে সুঠাম ও শক্তিমান্ করিয়া তুলুক্।

পরেশলাল রায়

বাখরগঞ্জ জেলার লাখুটিয়া গ্রামে ইহার পৈতৃক নিবাস। ইনি বাল্যকাল হইতে ইংলণ্ডে লেখাপড়া শিখিয়াছেন। কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করেন। বিলাতে পাঠ্যাবস্থায় তিনি বক্সিং শিক্ষা করেন এবং স্কুলে একটি চ্যাম্পিয়ান হন। পরে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়নশিপ" ও "অক্সফোর্ড ব্লু" লাভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে পরেশলাল সৈন্যবিভাগে যোগ দেন এবং অল্পকাল মধ্যেই "লেফটেনাণ্ট" পদ লাভ করেন। তাহার ছোট ভাই ইন্দ্রলাল রায় প্রথম মহা যুদ্ধের সময় উড়োজাহাজের চালক ছিলেন এবং আকাশ-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন।

পরেশলাল ১৯১৯ সালে এদেশে ফিরিয়া আসেন। "দি বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন" নামে বক্সিং প্রতিষ্ঠান তিনিই স্থাপন করেন। বাংলা দেশে সমস্ত বক্সিং প্রতিযোগিতা ইহারই নিয়মাধীন হইয়া পরিচালিত হয়। পরেশলালের শিক্ষাধীনে বহু বাঙালী যুবক বক্সিংএ কৃতী হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ বক্সার ফণীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ইহারই শিষ্য।

পরেশলাল সাধারণ্যে পি. এল. রায় (P. L. Roy) নামে পরিচিত।

লাঠিখেলায় বাঙালী

বাঙালী চিরকালই লাঠিখেলায় অভ্যস্ত ছিল। কোম্পানীর আমলেও লাঠির অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। সেকালের শিক্ষিত লাঠিয়ালগণের অসীম ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা লক্ষ্য করিয়া মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারী দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ; হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গলার আব্রু পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। বদমাইস তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল, তুমি তখনকার পিনালকোড ছিলে।"

সেকালের ভূস্বামিগণের পাইক সর্দার ও লাঠিয়ালগণের সাহস ও শৌর্যবীর্যের কীর্তিকথা আজও লোকের মুখে মুখে কিংবদন্তীতে জীবিত রহিয়াছে। বিক্রমপুরের যুদ্ধের পর মানসিংহ, কেদাররায়ের রাজ্য তাঁহার প্রধান অমাত্য রঘুরামের হস্তে অর্পণ করিয়া যান।

পুলিনবাবু (ডাহিনে) লাঠিখেলা শিখাইতেছেন

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রঘুরামের প্রধান সর্দার রামমালিকের লাঠিখেলার অদ্ভুত নিপুণতার কাহিনী আজিও লোকে গাহিয়া থাকে—

"রামমালিকের লাঠি
রঘুরায়ের মাটী ॥
উঠ্‌লে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পালায় বাঘ ॥
গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে ॥
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি ॥"

এমন কত রামমালিক সেকালের বাঙলার পাড়ায় পাড়ায় বিরাজ করিত।

পুলিনবিহারী দাস

বস্তুতঃ লাঠি-খেলোয়ারের অভাব বাঙ্‌লা দেশে কোন কালেই হয় নাই। কিন্তু পুলিনবিহারী দাসই সর্বপ্রথম দেশের শিক্ষিত তরুণদের ভিতর সংহত ভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাঠি শিখান। অন্যান্য লাঠিয়ালদিগের চেয়ে পুলিন বাবুর এই জায়গায়ই পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। বিশেষ করিয়া ছোট লাঠি আজ পর্যন্ত এমন সুন্দর নিয়মে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান করা লাঠির জন্ম-ও-কর্মভূমি ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই হইয়া উঠে নাই। ইহা আমাদের বাঙ্‌লার গৌরবের কথা বৈ কি।

১৯০৩ সালে পুলিন বাবু প্রথম লাঠি শিক্ষা আরম্ভ করেন—একটি মুসলমান লাঠিয়ালের নিকট। কিন্তু তাহার নিকট বেশী কিছু শিখিতে পারিলেন না। ইহার কিছু পরেই লর্ড কার্জন ঢাকা আসিলে ঢাকার তৎকালীন নবাব সাহেব প্রসিদ্ধ খেলোয়ার প্রোঃ মার্তাজাকে লাঠি খেলা দেখাইবার জন্য আনয়ন করেন। মার্তাজা একজন যাদুকর ও সার্কাস-ওয়ালা ছিলেন। তিনি ঠগীদের সহিত জেলে থাকিবার সময় তাহাদের নিকট হইতে লাঠি শিখেন। ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল পি. কে. রায় মার্তাজাকে একদিন কলেজে খেলা দেখাইতে বলেন। এই সময় পুলিন বাবু তাহার নিকট লাটি শিক্ষার সুযোগ পাইলেন। অধ্যবসায়ী পুলিন বাবু মার্তাজার খেলা দেখিয়া অল্প কিছু মাত্র আয়ত্ত করিতে পারিলেন। ইহার পর মার্তাজা যখন কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে থাকিতেন, তখন পুলিনবাবু তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট হইতে ধীরে ধীরে লাঠির ঘাত কৌশল শিখিয়া লন।

এই সময়ে বীরাষ্টমী ও ডাঃ পি, কে. রায় মহোদয়ের বিদায়োপলক্ষে পুলিন বাবু সর্বপ্রথম সর্বসাধারণে তাঁহার লাঠি খেলার কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রশংসা পান। এই সময় হইতে পুলিন বাবুর নাম সকলের নিকট পরিচিত হয়। তখন পুলিনবাবু ঢাকা কলেজের লেবরেটারী-অ্যাসিষ্টান্টের কাজ করিতেন।

১৯০৫ সালে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার পি, মিত্র, মনীষী বিপিন পাল প্রমুখ দেশ-নেতাদের উদ্যোগে যুবকগণের মধ্যে শরীর চর্চার আন্দোলন মূর্ত হইয়া উঠে, এবং নানা স্থানে ব্যায়াম-চর্চার সমিতি

গঠিত হয়। পুলিনবাবু তাহাদের অন্যতম পরিচালক মনোনীত হইয়া ঢাকায় আসেন।

ঢাকায় পুলিনবাবু স্বামীবাগ আশ্রমে স্থান নির্দেশ করিয়া যুবকদিগকে লাঠিখেলা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্র, চাকুরীজীবী, উকীল প্রভৃতি উৎসাহের সহিত লাঠি খেলা আরম্ভ করিলেন। অনধিক দুই বৎসরের নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চায় ঢাকার তরুণদলের চেহারা বদলাইয়া গেল। যাহারা অলস, দুর্বল ও ভীরু বলিয়া উপহসিত হইত, তাহারা যেন যাদুস্পর্শে সুস্থ, সবল ও সাহসী হইয়া উঠিল।

এই সময়কার লাঠির কৃত্রিম লড়াই (mock fight) বাস্তবিকই একটা প্রাণশক্তি জাগাইয়া দিয়াছিল। মার না খাইলে কেহ মার দিতে পারে না। আবার মারামারি করিতে হইলেও দশটা মার পিঠ পাতিয়া সহ্য করিবার মত ক্ষমতা ও ইচ্ছা লইয়াই যাইতে হয়। এই সমস্ত কৃত্রিম লড়াইয়ে সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, দল-চালনা প্রভৃতি পৌরুষজনক গুণগুলির অনুশীলন হয়। দুই দলে যখন লাঠি হাতে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া ভীষণবেগে পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত এবং লাঠির ঘাত-প্রতিঘাতে খেলার মাঠ মুখরিত হইয়া উঠিত, সে একটা দেখিবার দৃশ্য ছিল। এমনি করিয়াই সেদিন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, জাতির প্রাণশক্তি সজীব ও সতেজ হইয়াছিল।

পুলিনবাবুর "লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা" বাঙলা সাহিত্যে একটা যুগান্তর আনিয়াছে। এমন বিস্তৃতভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাঠির কথা, লেখায় আর প্রকাশ হয় নাই। লাঠি ও অসিতে তাঁহার

অসাধারণ দক্ষতার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইহাতে আমরা পাই। ইহা ছাড়া পুলিন বাবু যে ছোরাখেলায় ও জুজুৎসু বিদ্যায়ও অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা জানিতে পারি। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন কৃতী শক্তিধর পুরুষ হারাইয়াছি।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ

লাঠির অন্যতম সুদক্ষ খেলোয়ার ৺অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বড় লাঠিখেলায় সুবিখ্যাত। শিক্ষিত ও ভদ্র দলে তিনিই বড় লাঠির খেলা সংহতভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রথম প্রচলন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সামর্থ্য লাভের একটা প্রচণ্ড ইচ্ছার উন্মেষ হইল, সেই সময় হইতে অতুলবাবু ছেলেদের লাঠি শিখাইয়া আসিতেছিলেন। জীবনের শেষ দিনও ইহাই তাঁহার একমাত্র সাধনা ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, ১৩৩৫ সালের কাতিক মাসে তাঁহার পরলোক গমন হইয়াছে।

অতুলবাবু লাঠির হাতে খড়ি হয় সুবিখ্যাত লাঠিয়াল ৺কাঞ্চন সর্দারের নিকট। কাঞ্চন সর্দার ও রূপ সর্দার দুই ভাই ছিল। এরা ছিল বিখ্যাত রঘু ডাকাতের শিষ্য। রঘু ডাকাতের নামে এককালে বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খাইত। সরকারের হুকুমে যখন রূপ সর্দারের ফাঁসি হইল, তখন কাঞ্চন গা ঢাকা দিয়া হাওড়া জিলার উলুবেরিয়ার অধীন নতিপপুরে বাস করিত। সেই সময়ে বালক অতুলকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং লাঠি খেলার পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ইহার পরও অতুলবাবু লাঠি শিখিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অতুলবাবু বলিতেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইলাম, আমার গুরুর খেলার তুলনা পাইলাম না।

অমন খেলোয়ার আর একটি মিলিল না। স্বদেশীর যুগে এলাহাবাদ কংগ্রেস মণ্ডপে নিখিল ভারত লাঠি-প্রতিযোগিতায় খেলিয়া অতুলবাবু সর্বোচ্চ পদক পাইয়াছিলেন।

আশানন্দ ঢেঁকী

এই সকল আধুনিক শিক্ষিত লাঠিখেলোয়ার ছাড়া দেশে আর একদল লাঠিয়াল আছে যাহারা উত্তরাধিকারী সূত্রে এই লাঠির চর্চাটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই দেশী লাঠিয়ালের দল আজিও লাঠির ঘায়ে সবুজ মাঠ রাঙা করিয়া তোলে, শুভ্র বালুকাময় চরভূমি রক্তায়িত করে। ইহারাই ছিল পূর্বকার ভূস্বামীদিগের ঢালী সৈন্য (পদাতিক)।

আশানন্দ ঢেঁকী ইহাদেরই একজন ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আশানন্দের দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশের চোর ডাকাত অস্থির থাকিত। আজিও তাহার কত স্মৃতি-কাহিনী, কত অলৌকিক গল্প লোকের মুখে মুখে ভাসিয়া ভাসিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আশানন্দ নদীয়া-নিবাসী এক ব্রাহ্মণ সন্তান। একবার তিনি লাটের খাজনা লইয়া যাইতেছিলেন। পথে রাত্রি হওয়ায় এক বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। একদল ডাকাত তাহার টাকার সন্ধান পাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। আশানন্দ সেকালের নাম-করা লাঠিয়াল ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ হাতের কাছে আত্মরক্ষার কোন কিছু পাইলেন না, পাইলেন একটা ঢেঁকী। সেই প্রকাণ্ড ঢেঁকী ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকাতের দল আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইহার পর তিনি আশানন্দ ঢেঁকী নামেই সমধিক পরিচিত হইলেন।

সে সময় দস্যু-তস্করের উপদ্রব খুব বেশী ছিল। আর একবার আশানন্দ অনেক টাকা লইয়া কালেক্টরীতে যাইতেছিলেন। সঙ্গে মোটেই জনকয়েক পাইক। এমন সময় হঠাৎ প্রায় দুই শত দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। আশানন্দ ভীত হইবার লোক নন। তিনি সদর্পে লাঠিমাত্র সম্বল লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। সাম্‌নে আসিয়াই হঠাৎ দুইটি ডাকাতকে একেবারে বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। দস্যু দুইটি অনেক চেষ্টায়ও বন্ধনমুক্ত হইতে পারিল না। এই অসম্ভব ঘটনা দেখিয়া ডাকাতের দল ছুটিয়া পলাইল। আশানন্দ সেই অবস্থায়ই কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। লোকে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। কালেক্টর সাহেবও আশানন্দকে সাহসের যোগ্য পুরস্কার দিলেন।

আজ দেশের নানাস্থানে লাঠির চর্চা আবার আরম্ভ হইয়াছে। অনেক সঙ্ঘ-সমিতি ও স্কুল-কলেজে লাঠির চর্চা চলিতেছে। মেয়েরাও লাঠি ও ছোড়া খেলিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতেছে। জাতির এই নূতন উদ্যম সফল হোক, জাতি সবল ও সক্ষম হইয়া উঠুক। সুখের বিষয় নদীয়া-শান্তিপুরে আশানন্দের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সার্কাসে বাঙালী

গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র ন্যাশনাল জিমনাষ্টিক ক্লাব স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন চারিদিকে ন্যাশনালের হিড়িক পড়িয়াছিল। নবগোপাল 'ন্যাশনাল মিত্র' নামে পরিচিত ছিলেন। স্বদেশীযুগে হিন্দুমেলা শরীর-চর্চায় নব প্রেরণা দেয়। যে সকল যুবক এই উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া শরীর-চর্চায় মন দেন, তাহাদের মধ্যে কলিকাতার বাবু গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় অন্যতম। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়।

গৌরবাবু বাল্যকাল হইতে ডানপিটে ছিলেন। বীরত্ব-ব্যঞ্জক পৌরুষ খেলাধুলায় তাঁহার ঝোঁক খুব বেশী ছিল। ইনি হিন্দুমেলায় পাঞ্জাবী জাঠ পাঠান প্রভৃতি নয় জন পালোয়ানের সহিত এক আসরে উপর্যুপরি লড়িয়াছিলেন। আহিরীটোলার ডালপটিতে স্বর্গীয় পালোয়ান অবিনাশচন্দ্র ঘোষের একটা পোড়ো বাড়ী ছিল। গৌরবাবু ইহারই পোড়ো বাড়ীটায় দলবল সহ নানা প্রকার শরীর চর্চা করিতেন।

গৌরবাবুর চেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি আখড়া ও জিমনাসিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌরবাবু নিয়মিতভাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করিতেন।

প্রিয়নাথ বসু ও মতিলাল বসু

গৌরবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন (কলিকাতা) সিমুলিয়ার প্রিয়নাথ বসু। ইনি ও ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মতিলাল বসু বিখ্যাত 'বোসেস্ সার্কাসের' প্রতিষ্ঠাতা। মতিবাবু স্বামী বিবেকানন্দের সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন। ইঁহারই কথায় স্বামীজি লিখিয়াছিলেন; "He was doing great work than perhaps any Bengalee worker in setting an example in organisation & proving Bengalee nerve & pluck."

বাঙালীর মধ্যে প্রিয়নাথ বাবুই সর্বপ্রথম পিরামিড অ্যাক্ট ও জাগলিং অ্যাক্ট (Pyramid Act & Juggling act) চমৎকার করিয়া গিয়াছেন। জিমনাষ্টিকে তাঁহার জুরি কম ছিল। ভাল ব্যায়ামগীর অপেক্ষা তিনি ভাল ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। তিনি শহরে ও শহরের বাইরে অনেক ব্যায়ামাগারে শিক্ষকতা করিতেন। ইঁহারা সার্কাসের দল লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছেন।

'বোসেস্ সার্কাস' সমগ্র ভারতে বিলাতী কোম্পানীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিল। সামরিক বিভাগের ইংরেজ কর্মচারীরা পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন: I had no idea that the vaulting ambition of young Bengal aspired so high (Sir A. P. Palmer K. C. B. C. S. Commander. Tirah Expeditionary Forces)।

কৃষ্ণলাল বসাক

সমগ্র এশিয়াখণ্ডে কৃষ্ণলালের সার্কাসের নাম কে না জানে? কৃষ্ণলাল কলিকাতা আহিরীটোলার বসাক পরিবারে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত শোভারাম বসাকের গোষ্ঠীর ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই ব্যায়ামানুশীলনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং ১৭ বৎসর বয়সে তিনি হরাইজণ্টাল বারের খেলায় এরূপ দক্ষ হইয়া উঠেন যে, তাঁহার খেলা দেখিয়া আবেল ক্লেয়ার সার্কাসের (Abell Klaer Olmann Circus) মার্কিনবাসী মিষ্টার আবেল (Mr. Abell) তাহাকে স্বীয় সার্কাসে নিযুক্ত করেন। ইহার পর কলিকাতায় হার্মষ্টন ও উড়িয়ার সার্কাসেও তিনি খেলিতে নামিয়াছেন। তিনি আহূত হইয়া এই সব য়ুরোপীয় সার্কাসে যোগ দেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু যখন প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন, তখন তাহারই নিমন্ত্রণে কৃষ্ণলাল ভারতের প্রতিনিধিরূপে প্রদর্শনীতে গমন করেন। তথায় তাঁহার নানারূপ ব্যায়াম ক্রীড়া যাহারা দেখিয়াছিলেন, তাহারাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রদর্শনীতে মতিলালের আহ্বানে ভারতীয় এ্যাক্রোব্যাট, জিমনাষ্ট, কুস্তিগীর, গায়ক, বাজীকর, বাদক, বীণকার, ভাস্কর প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পী যাত্রা করেন। মতিলাল ইহাদের ম্যানেজার হইয়া যান।

নানা সার্কাসের সঙ্গে তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে গিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বয়ং একটি সার্কাস

দল গঠিত করেন—উহা "গ্রেট ইষ্টার্ণ সার্কাস" নামে ও পরে "হিপোড্রোম সার্কাস" নামে পরিচিত হয়। উহাতে নানা দেশের প্রায় শতেক খেলোয়ার ও বহু জন্তু ছিল। জার্মাণ মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার দলের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং উহা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার শেষ জীবন নানা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠায় ও সেগুলিকে সাহায্য দানে অতিবাহিত হয়।

১৩৪২ সালের ৯ই কার্তিক বরাহনগরে কৃষ্ণলালের মৃত্যু হয়।

শিকারে বাঙালী

শিকার ক্ষাত্র-ক্রীড়া। শিকারের উৎসাহ ও উন্মাদনা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের জিনিস। ইহারই রোমান্স বাঙালী-জীবনকে আকর্ষণ করিয়াছে।

জ্ঞানদাপ্রসন্ন চৌধুরী

ইনি গোবরডাঙ্গা-নিবাসী। বাঙালী শিকারীদের মধ্যে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ শিকারী ছিলেন। ১৮৬৬ সালে তাঁহার জন্ম হয় এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ইনি সঙ্গীত ও শিকারে অনুরাগী ছিলেন। ইনি প্রায় দেড় শত রয়েল বেঙ্গল বাঘ, ৩০টি চিতা, ৩০টি মহিষ, ৫ঠি হাতী শিকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কাদাখোঁচা (Snipe) পাখী শিকারে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। উড়ন্ত ঝাঁকের অন্ততঃ ৭০।৮০টি কাদাখোঁচা তাঁর লক্ষ্যের মুখে পড়িতই। ১৯১৮ সালে এই কৌশলী শিকারী পরলোক গমন করেন।

কুমুদনাথ চৌধুরী (কে. এন্. চৌধুরী)

ইনি পাবনা জেলার বিখ্যাত চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম্. এ., বি. এল্ পাশ করিয়া বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতেন।

"প্রায় কুড়ি একুশ বৎসর হইল, এলাহাবাদে একটি ভারতবর্ষীয় ব্যায়াম-প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে ভারতের নানাস্থান হইতে অনেক হিন্দু-মুসলমান-শিখ পালোয়ান এবং ইংরেজ গোরা স্ব স্ব শক্তি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বিহারের তৎকালীন নেতা স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সেই নিখিল ভারতীয় মল্ল-ক্রীড়া প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বাঁকীপুর হইতে বাঙালী বীর বর্ধাতিবাবুকে আপন খরচায় এলাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। তথায় বল পরীক্ষণীয় অন্যান্য যন্ত্রমধ্যে একটি স্প্রীং পিসটন বা চাপদণ্ড (Spring piston) রক্ষিত হইয়াছিল। যিনি ঐ পিস্‌টনে অঙ্কিত ১৯ পর্যন্ত ঠেলিয়া দণ্ডটিকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহারই জিৎ হইবে। কিন্তু পিস্‌টনে হাত না দিয়া কেবল বুক দিয়া বুকেরই জোরে ঠেলিতে হইবে। কি পশ্চিমা পালোয়ান, কি শিখ, কি গোরা, উপস্থিত কেহই যখন সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, তখন যুবক অমরনাথ অগ্রসর হইয়া পিস্‌টনে বক্ষ সংলগ্ন করিয়া সবলে তাহা ১৯ চিহ্ন পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। দর্শকমণ্ডলী আনন্দধ্বনি ও প্রশংসাবাণীতে প্রদর্শনীস্থল মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

"বর্ধাতি বাবুরা চার সহোদরে যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন তাহাদের আহার্যের পরিমাণ দেখিবার বস্তু হইত। এক একজনের পাত্রে যে রুটির গোছা উপর্যুপরি সাজাইয়া দেওয়া হইত, তাহা পাত্র হইতে প্রায় কণ্ঠ পর্যন্ত উঁচু হইত।

"দুঃখের বিষয় প্রবাসী বাঙালীদের গৌরব চিরকৌমার্যব্রতী নিরামিষ-ভোজী বিমল-চরিত্র অমরনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বংশগত বহুমূত্র রোগে ৪৫ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

এলাহাবাদের তরুণ ব্যায়ামবীর অপূর্বকুমার দাস ও বারীন্দ্রনাথ দেব ব্যায়াম-চর্চায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা এলাহাবাদের এই দুই তরুণ প্রবাসী ব্যায়াম-বীরের ছবি দিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয়, ইহাদের মধ্যে বালক বারীন্দ্রনাথ দেব অল্প বয়সেই পরলোক গমন করিয়াছেন।

ড্রিল ও প্যারেড

বাঙলাদেশে শরীর-চর্চা এক নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের পর হইতে। কংগ্রেসের উক্ত অধিবেশনের সময় হইতে ড্রিল ও প্যারেড বাঙালী যুবকদের প্রাণে এক নবচেতনা আনিয়াছে। ব্যায়াম-চর্চার মধ্যে ড্রিলের মত জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণ ও শক্ত-সমর্থ করিবার এমন শিক্ষা আর নাই। দেশের সৌভাগ্য, আজ এদিকেও জাতির নজর পড়িয়াছে। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে অতি অল্প সময়ে যেরূপ সুসংহত ও সুশিক্ষিত ভলান্টিয়ার-দল গঠিত হইয়াছিল, উহাতে আশা ও ভরসা খুবই হয়। দেশের নানাস্থানেই আজ ড্রিলের চর্চা আরম্ভ হইয়াছে; সুনিয়ন্ত্রিত হইলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের এই ম্লান চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে। এই কংগ্রেস উপলক্ষে ড্রিল ও প্যারেডে মেয়েরাও যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রশংসনীয়।

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোর এ বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছে। আবার কিছুকাল মধ্যে ড্রিল ও ব্যায়ামাদি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছেলেদেরও অবশ্য-করণীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই।

মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চা

মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চায় এতদিন দেশ একেবারে উদাসীন ছিল। আজকাল বাংলায় নারী-জাগরণের একটা সাড়া আসিয়াছে। ইহারই ফলে আমাদের দৃষ্টি জাতির অর্ধচৈতন্য এই নারীসমাজের উপরেও পড়িয়াছে। এতদিন অন্তঃপুরের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নারীর কর্মগণ্ডী নির্দিষ্ট ছিল, আজ সেই গৃহলক্ষ্মীর আহ্বান আসিয়াছে, তাঁহাকে বিশ্বের সকল কর্মযজ্ঞে যোগ দিতে হইবে। ঘরে ও বাহিরে, গৃহে ও সমাজে নারীকে আজ আপনার দানে ও কর্মে সকল শূন্যতা ও দীনতা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে—জাতিকে পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ দিতে হইবে।

শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়া দেহকে কর্মপটু করিবার জন্য নারীসমাজে একটি নব প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে শরীর-চর্চা অনেক কাল হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছিল। সেই স্বদেশী যুগে বাঙ্‌লার মহিমময়ী বীরমাতা সরলা দেবী ইহার প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহার প্রচেষ্টা শুধু বাঙ্‌লার পুরুষকে নয়, বাঙ্‌লায় নারীসমাজেও একটা চেতনা আনে। বীরাষ্টমী সমিতি ইহারই ফল। তারপর বিগত কয়েক বছর বাঙ্‌লার নারীসমাজ আপনার শারীর-সামর্থ্য লাভের জন্য একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন, দেশের নানাস্থানে লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতি আত্মরক্ষার সহজ ও অব্যর্থ উপায়গুলি আয়ত্ত

করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলে অনেকগুলি মহিলা-প্রতিষ্ঠানে শরীর-চর্চা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল।

বাঙালী মেয়ের শরীর সাধনায় এই নব উদ্যম ও নূতন গতি জয়যুক্ত হোক্।

দুই একজন বাঙালী মেয়ের শক্তির পরিচয় এখানে লিখিলাম।

সুশীলাসুন্দরী

"যে সময়ের কথা বলিতেছি সে যুগে কোন বাঙালীর মেয়ের পক্ষে প্রকাশ্য সার্কাস রিং এ অবতীর্ণ হইয়া খেলা দেখান নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল। বাঙলাদেশ সে অভাবও পূরণ করিয়াছে। সার্কাস-জগতে সে গৌরবের পাত্রী প্রথম বাঙালী মহিলা-খেলোয়াড় শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী। ইহার পূর্বে অপর কোন বাঙালীর মেয়ে সার্কাস খেলায় যোগদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। শুধু যোগদান করা নহে, সুশীলাসুন্দরীর কৃতিত্ব—তাঁহার অদ্ভুত শারীরিক শক্তির ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন-ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। কেহ কেহ বলেন, সুশীলাসুন্দরী সমগ্র ভারতের হিংস্র ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইতে সর্বপ্রথম মেয়ে-খেলোয়াড়। মহারাষ্ট্র দেশীয় বহু মহিলা বহুদিন হইতে সার্কাস খেলায় অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু বন্য ব্যাঘ্র লইয়া প্রকাশ্য সার্কাসে খেলা দেখাইয়া কেহ যশস্বিনী হইতে পারে নাই। শ্রীমতী সুশীলা কলিকাতার সোনাগাছি অঞ্চলের অধিবাসিনী। সুশীলার দুই পুত্র—কনিষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্রনাথ নিউ বেঙ্গল সার্কাসের পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী।" (ব্যবসা ও বাণিজ্য)

প্রমীলাসুন্দরী

প্রায় ২৫।২৬ বছর পূর্বে বাঙালী মেয়ে প্রমীলাসুন্দরী সার্কাস খেলা দেখাইয়া লোকের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন। বেণীবাবুর 'এ্যাক্রোব্যাটস সার্কাসে' ইনি খেলা দেখাইতেন, লোক বোঝাই পাল্কীগাড়ি বর্শা দিয়া ঠেলিয়া নিতেন, ৩০ মণ ওজনের পাথর বুকে ভাঙ্গিতেন, তিন মণ ওজনের গোলা লইয়া খেলা দেখাইতেন। তিনি 'বোসেস্ সার্কাসে'ও খেলা দেখাইয়াছেন।

অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি কলিকাতা-নিবাসী বাবু নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি ক্রমাগত নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি কঠিন রোগে ভুগিয়া দুর্বল হইয়া পড়েন। সুস্থ সবল হইবার পর ইনি নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম-চর্চা আরম্ভ করেন। ইহাতে ইনি বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। ক্রমশঃ ইনি লাঠি ছোরা যুযুৎসু খেলাতেও সুদক্ষ হইয়া উঠেন। কয়েক বছর পূর্বে কলিকাতায় রামমোহন রায় শতবার্ষিকী প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ইনি বেগবান্ মোটর গাড়ী রোধ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তখন ইহার বয়স ছিল মাত্র পনের বছর। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এমন শক্তিমত্তার পরিচয় সত্যই দুর্লভ।

শরীর-চর্চা-প্রতিষ্ঠান

অতীন্দ্র বাবু ও শিমলা ব্যায়াম সমিতি

অতীন্দ্রনাথ বসু কলিকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। অতীন বাবু যৌবনকাল হইতেই শরীর-চর্চায় দক্ষতা লাভ করেন। তাঁহাদের বাড়ীতেই কুস্তি ও ব্যায়ামের একটি আখড়া করিয়াছিলেন। এখানে ছেলেরা জিমনাষ্টিক ও কুস্তি করিত। অবশেষে ১৩২৬ সালে তিনি শিমলা ব্যায়াম সমিতি নামে একটি বড় রকমের সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

বাঙালী ছেলেরা যাহাতে শরীর-চর্চাদ্বারা সবল ও সাহসী হইয়া উঠে, এই উদ্দেশ্যেই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও এই কার্যে বাবুর উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাঁহার প্রচেষ্টায় এই সমিতি একদল তরুণ ব্যায়ামগীর তৈরি করিয়াছেন—তাহারা সত্যই আমাদের গৌরব।

বর্তমানে এই সমিতির ব্যায়াম-শিক্ষক অতীনবাবুর পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু। বীরেনবাবু ইতিমধ্যে কুস্তি ও যুযুৎসু সম্বন্ধে বাঙলা পুঁথি লিখিয়া দেশের একটি বড় অভাব দূর করিয়াছেন। বীরেনবাবু যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। বাল্যকালে ইনি কুস্তি লাঠি ও যুযুৎসু বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

অতীনবাবু বাঙালী কুস্তিগীর ছেলেদের মধ্যে নিখিল-বঙ্গ কুস্তি প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করিয়াছেন। প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা

হইয়া থাকে। বীরেনবাবু এ বিষয়ে অনেকখানি সাহায্য করিয়া থাকেন।

এই সমিতির একটি উজ্জল রত্ন শ্রীমান্ ঘনশ্যাম দাস। ইহার শরীর সুগঠিত, মাংসপেশীসমূহ সবল এবং শরীর শক্তিসম্পন্ন। শিমলা ব্যায়াম সমিতিতে ভর্তি হইয়া নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করেন। এই কয় বৎসরের একান্ত অধ্যবসায় ও চেষ্টায় এবং ব্যায়াম শিক্ষক বীরেনবাবুর শিক্ষায় আজ এইরূপ সুখ্যাতি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহার নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি দেখিলেই ইহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

সিমলা ব্যায়াম-সমিতি-পরিচালিত ভারতীয় কুস্তি প্রথায় বঙ্গীয় প্রতিযোগিতায় ১৯৩৭ সালে ৯ ষ্টোন বিভাগের চাম্পিয়ন, ১৯৩৮ সালে ১০ ষ্টোন বিভাগের চ্যাম্পিয়ন, ১৯৩৯ সালে ১১ ষ্টোন বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ সালে দৈহিক সৌন্দর্যে বিজয়ী হন। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে খিদিরপুর ব্যায়াম-সমিতি-পরিচালিত নিখিল কলিকাতা পেশী-প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় (All Calcutta Muscle-posing Competition) দৈহিক সৌন্দর্যে বিজয়ী হন। ১৯৩৮ সালে হাটখোলা ব্যায়াম-সমিতি-পরিচালিত নিখিল বঙ্গ পেশী-সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় (All Bengal Muscle-posing Competition) দৈহিক সৌন্দর্যে বিজয়ী হন। ১৯৩৯ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে দৈহিক সৌন্দর্যে বিজয়ী হন।

কুস্তিতেই ইনি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ইনি বহু জোরের খেলা দেখাইতে পারেন। সকল

বিষয় অপেক্ষা তাহার দৈহিক গঠনের সুষমাই লোভনীয় ও অনুকরণযোগ্য।

ইহা ছাড়া এই সমিতির তরুণ ব্যায়ামগীরেরা অনেকেই কুস্তি-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

বর্তমানে এদেশে শরীর-চর্চার অনেকগুলি ভাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। শরীর চর্চার এরূপ ব্যাপক প্রয়াস এদেশে আর পূর্বে দেখা যায় নাই।

সেকালের বাংলায় কুস্তি

জাতি জাগে বর্ষার বন্যাধারার মতো। তার প্রবল প্রবাহে জাতির সকল অঙ্গ সতেজ হয়ে ওঠে। তার মনে জাগে নূতন আশা, দেহে জাগে পুলকের উন্মাদনা। মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়িয়ে চলে তার দেহের উন্নতি।

পশ্চিমের উঠ্‌তি জাতগুলোয় আমরা এইটে বিশেষ করে দেখতে পাই। 'জার্মানীতে খেলাধূলা, শারীরিক ব্যায়াম ও কসরৎ অতিশয় প্রবলরূপে দেখা দিয়েছে। সাঁতার কাটা, দৌড়, হকি, টেনিস, নৌচালনা, কুস্তি, পালোয়ানী ইত্যাদি সকল দিকেই আবাল-বৃদ্ধবনিতার ঝোঁক দেখিতেছি। স্বাস্থ্যোন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি জার্মান সমাজে আজকাল এক নয়া ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।" [১] আবার রাশিয়ায় দেখছি, শারীরিক পূর্ণতা সাধনা সেখানে একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ লক্ষ ক্লাব বা সমিতি গড়ে উঠেছে ঃ আর এরা সকল রকম খেলাধূলায় যোগ দিচ্ছে। রাশিয়ায় একটা চলতি কথা আছে ঃ 'শিশুরাই জীবনের ফুল।' সেই ফুলকে পুরো বিকশিত করবার এমন বিরাট আয়োজন এমন বিপুলভাবে আর হয় নি।' [২]

বাংলা দেশেও জাগরণের ঢেউ এসেছে। এদেশে আগে শরীর-চর্চার চল ছিল। একশ বছর আগেও কুস্তি-কসরতের প্রকাশ্য

১ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার (পরাজিত জার্মাণী পৃঃ ১২৪)

২ The Leader of 8. 9. 36.

প্রতিযোগিতা হত। সেকালের কাগজে অনেক কুস্তির খবর বের হয়েছে। ১৮২৫ সালের 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত হয় ঃ

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বাগানে এক কুস্তির দঙ্গল হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায় ব্যাঙ্ক-অব্-বেঙ্গলের প্রথম বাঙালী ডিরেক্টর এবং উলুবেরিয়া হইতে পুরী সিংহ দরজা পর্যন্ত 'কটক রোডের' প্রতিষ্ঠাতা। এই বাগানে প্রায় ৩০ জন লোকের দঙ্গল হয়। সাহেবেরাও এই দঙ্গল দেখিতে আসিতেন। পামর সাহেবের এক অতিকায় ভৃত্য ছিল। তাহার সঙ্গে নন্দকুমার ঠাকুরের বৈদ্যনাথ নামে এক জোয়ান ভৃত্যের দঙ্গল হয়। এই লড়াইয়ে বৈদ্যনাথ জয়ী হয় এবং দর্শকগণ ঘন ঘন করতালি দেন। নন্দকুমার বাবু স্বয়ং গায়ের একলাই-শিরোপা খুলিয়া বৈদ্যনাথকে পুরস্কার দেন। এই কুস্তিতে যারা যোগদান করেছিল তারা সকলেই পুরস্কৃত হয়েছিল। চাঁদা তুলে একটা ফণ্ড করা হয়েছিল, তা থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হত।

১৮২৭ সালেও একটি বিশেষ কুস্তির বিবরণ প্রকাশিত হয়। সমাচার দর্পণের নিজের ভাষায় বলি—"স্বদেশীয় বিদেশীয় মোগল পাঠান মুসলমান বাঙালী তাহারা দুই দুই জন এক এক বার মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল। যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক পায়। যে ব্যক্তি জয়ী হয় তাহার অধিক প্রাপ্ত হয়। এই কুস্তি দর্শনে হৃষ্ট মনে ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত বিচারকর্তা সাহেব লোকেরা ও আর আর ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক মান্য লোকও গিয়াছিলেন।"

১৮৩৬ সালে বালি গ্রামে মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন অতিশয় শক্তিমান্ কুস্তিগীর ছিলেন। ঐ অঞ্চলে সে-সময়ে রাধা গোয়ালা ও তাহার ছেলেরা নামকরা কুস্তিগীর ছিল। মহেশচন্দ্র তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বহু বছর কুস্তি শিখাইতে পারিতেন। মহেশচন্দ্র যে-কোন লোককে কুস্তিতে আহ্বান করিয়াছিলেন।

আমরা সমাচার-দর্পণে এই খবর প্রকাশিত দেখিয়াছি।

এই সময়ে আর একটি কুস্তি হয় পাথুরিয়াঘাটার দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাড়ীর সম্মুখে। ইহাতে বাঙালী বালকেরা শুধু নয়, বালিকারাও যোগদান করেছিল। শতবর্ষ পূর্বে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় বাঙালী বালিকাদের যোগদান সত্যই জাতির পরিপূর্ণ প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। সেদিন 'সমাচার-দর্পণ'ও আনন্দে লিখেছিল: "বিশেষতঃ বালিকাদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হয়।"*

আর আজ? ছেলেদের মধ্যে শক্তিচর্চা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বটে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তার চিহ্ন বড় কম। কেন এমন হ'ল? একশ' বছরে এমন দারুণ পরিবর্তন কিসে সম্ভব হয়েছে? এর জবাব বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই সঞ্জীব চাটার্জি লিখেছেন:

"যাহাদের বিশ্বাস যে ইংরেজ-প্রসাদাৎ ইদানীং কুস্তি আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের ভুল। ইংরেজী শিক্ষা ও শাসনে বরং আমাদের কুস্তি উঠিয়া গিয়াছে। প্রাতে বালকেরা পাঠাভ্যাস করে, কুস্তির অবকাশ থাকে না। ইতর লোকেরা কুস্তি করিলে তাহাদের উপর

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা।

পুলিশের দৃষ্টি পড়ে, সুতরাং কুস্তি রহিত হইয়াছে। পূর্বে দেখিয়াছি, ইতর লোকদিগকে কোন কার্যের ভার দিলে তাহারা তাল ঠুকিয়া সম্মতি জানাইত। এখন আর সে তাল ঠোকা নাই; কারণ সাধারণ লোকের মধ্যে আর সে কুস্তি নাই, সে বল নাই।"

সুখের বিষয়, বাঙালী-জীবনে আবার ব্যায়াম-চর্চার একটা আলোড়ন এসেছে। তারই ফলে স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছে ক্লাব, সমিতি, আখড়া।

কিন্তু একটি নিখিল ভারতীয় কুস্তি-সমিতি এবং সর্বজনগ্রাহ্য কুস্তির নিয়মকানুন আজও গঠিত হয় নাই। ভারতীয় কুস্তি চর্চার উন্নতি ও বহুল প্রচার করিতে হইলে ইহা আজ একান্ত আবশ্যক।

পৃথিবী-পর্যটনে বাঙালীর ছেলে

শরৎচন্দ্র রায়

"শরৎচন্দ্র রায় নামে একটি সতের বছরের বালক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে পদব্রজে পৃথিবী পরিভ্রমণে বের হয়েছিলেন। সে আজ আট বৎসর আগের কথা। প্রায় সাত হাজার মাইল অতিক্রম করে অবশেষে তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হন।

"শরৎচন্দ্র কলিকাতা হতে বার হয়ে প্রথমে যান পেশোয়ারে। সেখান থেকে সীমান্ত প্রদেশ পেরিয়ে খাইবার গিরিসঙ্কট অতিক্রম করবার সময় তিনি বন্দী হন আফ্রিদিদের হাতে। এখানে অনেক লাঞ্ছনা তাকে সহ্য করতে হয়। কোন রকমে সেখান থেকে মুক্তি লাভ করে যান কাবুলে। তারপর পারস্য ঘুরে ককেশাস পর্বত লঙ্ঘন করে, পথে আরো অনেক রকমের নিগ্রহ সহ্য করে তিনি উপস্থিত হন রাশিয়াতে। সেখানকার মস্কো লেনিনগ্রাড প্রভৃতি স্থান দেখা শেষ হলে তিনি ধরলেন জার্মানীর পথ। জার্মানীর নাজি গবর্ণমেণ্ট তাঁকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করলেন। তিনি নিক্ষিপ্ত হলেন আবার কারাগারে। অনেক কষ্টে কারাগার হতে মুক্ত হয়ে তিনি যান ইংলণ্ডে। নিঃস্ব, রিক্তহস্তে এই যুবকটি এইবার ফেরিওয়ালার কাজ নিয়ে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু এর আগেই পথশ্রমে নানা রকমের নির্যাতনে ও অনাহারে তার দেহ ভেঙ্গে পড়েছিল। লণ্ডনে তিনি বারমাস

ছিলেন। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংলণ্ডের একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

বিমল মুখার্জি

১৯২৫ সালে ইনি দুই বন্ধুসহ কলিকাতা থেকে পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হন। এশিয়া, ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া ইনি ১৯৩৭ সালে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহার বয়স তখন ৩৭ বছর। তিন বন্ধুর মধ্যে ইনিই সফলকাম হইয়াছেন।

রামনাথ বিশ্বাস

গত ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস সিঙ্গাপুর ত্যাগ করিয়া সাইকেলে মালয় প্রদেশ, শ্যাম, ইণ্ডোচীন, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, কানাডার একাংশ, বালি, মাঙ্গুই, রেঙ্গুন, মণিপুর, কলিকাতা, পেশোয়ার, আফগানিস্থান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, লেভান্ট, তুর্কী, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, জেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি বর্তমানে আমেরিকা ও আফ্রিকা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইতিপূর্বে এরূপ প্রচেষ্টা কেহ করে নাই। এই প্রস্তাবিত ভ্রমণ শেষ হইলে তিনিই একমাত্র ও প্রথম ব্যক্তি হইবেন যিনি বাইসাইকেলে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রমণকারীদের জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইংরাজীতে এক পুস্তক লিখিতেছেন। উহাতে ভ্রমণকারীদের অনেক সুবিধা হইবে।

তরুণ বাঙ্‌লার শারীর সম্পদ্

একদিন বাঙালীর স্বাস্থ্য ও শরীরের অনুপম সৌষ্ঠব দেখিয়া প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্বে লর্ড মিণ্টো লিখিয়াছিলেন—

এমন সুন্দর জাতি আমি আর দেখি নাই। মাদ্রাজীদেরও আমি প্রশংসা করিয়াছিলাম। ইহারা মাদ্রাজীদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। উহারা ছিল কৃশ। ইহারা দীর্ঘকায় পেশীবহুল এ্যাথ্‌লেটের মতো চেহারা—সুগঠিত এবং মুখমণ্ডল ও অঙ্গসৌষ্ঠব নিরূপম। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানদের ন্যায় এদের দেহ, এবং তাহাও বহুবিচিত্র।

"I never saw so handsome a race. These are much superior to the Madras people, whose form I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features of the most classical European models, with great variety at the same time."*

যাহাদের অতুলনীয় শরীর-সম্পদ্ বিদেশীয়দিগেরও বিস্ময় উদ্রেক করিত, আজিকার বাঙালীর ম্লান, শ্রীহীন ও কঙ্কালসার চেহারা দেখিয়া কে বলিবে, ইহারাই শতবর্ষ পূর্বের পৌরুষ বাঙালীর বংশধর?

* Lord Minto's Letter dated the 20th September, 1807 quoted in 'A Dying Race—How dying' by K. L. Sarcar M. A. B. L.

এই অতি বড় দুঃখের পশ্চাতে যে বিষাদময় অতীত লুকায়িত রহিয়াছে, সে করুণ ইতি-কথা না-ই বা বলিলাম। বাঙালীর শরীর-সম্পদের ধ্বংসের ইতিহাস অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী।

তারপর অনেক কাল পরের কথা। বাঙালীর জীবনে সেদিন এক পুণ্যতিথি, যেদিন বাঙালী ৺নবগোপাল মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে স্বদেশী-মেলায় শরীর-চর্চার কঠোর প্রয়োজনীয়তা চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল। সে প্রায় সত্তর বছর আগেকার কথা। সেই স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ হইতে বাঙালীর শরীর-সাধনা ফল্গুর নিরবচ্ছিন্ন ধারার মত ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। বিশেষভাবে বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই শরীর-চর্চার আন্দোলন সারা দেশময় ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। ইহারই ফলে আমরা একদল তরুণ যুবক পাইয়াছি যাহারা শরীর-সাধনায় সাফল্য লাভ করিয়া বাঙালীর লুপ্ত দেহ-শ্রী ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাহাদের জন-কয়েকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। ইঁহাদের পরিচয়ে তরুণ বাঙলার প্রাণে উৎসাহের নবধারা নামিয়া আসুক।

ক্যাপ্টেন ডাঃ ভূপেশচন্দ্র কর্মকার

ভূপেশচন্দ্র যখন রিপণ কলেজের বি-এস্‌সি ক্লাশের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার ব্যায়ামচর্চা বিশেষ ভাবে শুরু হয়। ইহার পর ইনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে পড়েন। ১৯২৭ সালে কলিকাতায় যে All-Indian Best Physique Competition হইয়াছিল, তাহাতে ইনি শীর্ষস্থান অধিকার

করিয়াছিলেন। অথচ ইহার দুই বছর পূর্বে যখন প্রোঃ ঠাকুরতার নিকট ব্যায়াম শিখিতে আরম্ভ করেন, তখন ইহার শরীরে খানকয়েক হাড় ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় নাই। কয়েক বছর নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চার ফলে প্রাচীন গ্রীসীয় অতুলনীয় শরীর-সৌষ্ঠবও তঁহার দেহ-শ্রীর নিকট হার মানিত। তাঁহার শরীরের ওজন ১১ ষ্টোন ৬ পাউণ্ড। ইনি পেশী সঙ্কোচন, লোহার পাত মোচরানো, মোটর রোখা, হিউম্যান ব্রিজ প্রভৃতিতে দক্ষ।

ডাঃ কর্মকার ডাক্তারি পাশ করিয়া বিলাত হইতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। গত মহাযুদ্ধে ইনি ডাক্তার হিসাবে যুদ্ধে যোগদান করেন। ইনি বর্তমানে নিখিল বঙ্গ ফিজিকাল কালচার ইন্‌ষ্টিটিউটের ফিজিকার ডিরেক্টার।

সত্যপদ ভট্টাচার্য বি. এস্‌সি.

ইনি ভার-উত্তোলনে সুদক্ষ ছিলেন। ১৯২৯ সালে ইনি রিপণ কলেজ হইতে বি-এস্‌সি পাশ করেন। বি-এস্‌সি পড়িবার সময় ইনি ১৯২৮ সালে নিখিল ভারত ভার-উত্তোলন-প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। বাঙালীর সাধারণ খাদ্য ডালভাতই ইহার নিত্যকার আহার ছিল। ১৯২৫ সালে যখন প্রোঃ ঠাকুরতার নিকট ব্যায়াম-চর্চা আরম্ভ করেন, তখন ইহার স্বাস্থ্য ও শরীর সাধারণ রকম ছিল। দেড় বছর নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চার ফলে এই নয়ন-লোভন শরীরখানি গঠিত হইয়াছে; এই সময়ে ইহার বুকের বেড় ছিল ৪৮ ইঞ্চি।

শ্রীপ্রমোদেশ্বর বসু

ইনি যখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বি. এ. ক্লাশে পড়িতেন সেই সময় ইনি একই-দিকে চলন্ত দুখানা মোটর টানিয়া রাখিতে পারিতেন, লৌহদণ্ড বাঁকা করিতে পারিতেন, মোটর অ্যাক্সিডেন্ট (motor accident), Fatal jump ও human bridge প্রভৃতিও করিতে পারিতেন। ইনি এ সকলই নিজে নিজে অপরের সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা করিয়াছেন। ইনি প্রথমে বুকডন, বৈঠক, মুগুরভাজা ও কুস্তি লড়িয়াছেন, বারবেল ও বারের কসরৎ করিতেন। বছর দেড়েকের ব্যায়াম-চর্চার ফলে ইহার শরীরের এই চমৎকার উন্নতি লাভ হইয়াছে। ইহার ওজন ১৭০ পাউণ্ড, বুকের বেড় ৪৬ ইঞ্চি, বাহু (Bicep) ১৫ ইঞ্চি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখার্জি

ইনি যখন বি-এস্‌সি পড়িতেন, তখন প্রোঃ ঠাকুরতার শিক্ষকতায় দুই বছর নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চার ফলে ইহার অতি সুন্দর সুপুষ্ট ও সুগঠিত মাংসপেশীসমূহ (Clearcut heavy muscles) গঠিত হইয়াছে। আড়াই মণ ওজন অনায়াসে তুলিতে পারিতেন।

শ্রীবিজয়কুমার মল্লিক

ছোটকালে ইহার শরীর অতি ক্ষীণ ছিল ; বাধ্য হইয়া সেকেণ্ড ক্লাশেই পড়াশুনায় ক্ষান্ত দিতে হয়। লিভার অতি খারাপ ছিল, চোখের দৃষ্টি এত ক্ষীণ হইয়াছিল যে তিন হাত দূরের লোক পর্যন্ত

চিনিতে পারিতেন না। সকলেই তাহার জীবনের আশা একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি বিষ্ণুচরণ প্রভৃতির শরীর-চর্চা দেখিয়া সঙ্কল্প করিলেন, শরীর ভাল করিবেনই। ক্রমান্বয়ে দেড় বছর (একদিনও বাদ না দিয়া) ব্যায়াম-চর্চার ফলে ইহার শরীরের এই অসাধারণ উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে। এককালে যাহার হাড়গুলি একটি একটি করিয়া গোনা যাইত, আজ তাঁহার দেহের মাংসপেশীর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। ইনি পেশীসংকোচনে বিশেষ পারদর্শী।

বিজয়বাবুর ভবানীপুরস্থ বাড়ীতে মল্লিকস্ হেল্থ হোম নামে একটি শরীর-চর্চা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তরুণদের ব্যায়াম চর্চায় উৎসাহ দিতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠান হইতে যে সকল তরুণ ব্যায়ামবীর বাহির হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীহরিপদ মুখার্জি ও সুদেহী শ্রীভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ বি. এসসি., বি. এল.

বাঙালার মধ্যে ইনি বোধ হয় প্রকাশ্যভাবে সাধারণের নিকট muscle control (মাংসপেশীর স্বেচ্ছানুরূপ সঞ্চালন) দেখাইয়া প্রথম প্রশংসা অর্জন করেন। ছোটকালে ইহার শরীর নেহাৎ সাধারণ রকমের ছিল এবং ইনি অতিশয় রোগা ছিলেন। ইহার muscle controlএ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া অনেক সাহেবও ইহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আসিয়া থাকেন। যুযুৎসু বিদ্যায়ও ইহার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে।

বিষ্ণুবাবু রাজেনবাবুর কৃতী ছাত্র। বিষ্ণুবাবুর ভাই আমেরিকা-ফেরত বিখ্যাত ৺স্বামী যোগানন্দ। স্বামী যোগানন্দের শরীর-চর্চা সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান ছিল। তাঁর উপদেশও বিষ্ণুবাবুর পেশী-সংকোচনে সহায়তা করিয়াছে। ১৯৩২ সালে বিষ্ণুবাবু ব্যায়াম চর্চা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং ১৯৩৯এ আমেরিকা গিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার জিমনাসিয়াম হইতে ইতিমধ্যে বহু শক্তিশালী তরুণ ব্যায়ামবীর তৈরি হইয়াছেন। বিষ্ণুবাবু ভারতীয় শারীরিক শিক্ষা কংগ্রেসের সভাপতি এবং ব্যায়াম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। বিষ্ণুবাবু যোগব্যায়াম প্রচার কার্যে বিশেষ অগ্রণী।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন বি. এ.

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে বাড়ী। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন এবং কিছুকাল কলেজেই ব্যায়াম-শিক্ষকতা করেন। ভার-উত্তোলন, লোহার পাত জড়ানো, মোটর রোখা প্রভৃতি বিষয়ে ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা। ইঁহার উদ্যোগে অনেক স্থানে শরীর চর্চার জন্য ব্যায়ামাগার ও ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি ভারতীয় শারীরিক শিক্ষা কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ব্যায়াম পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দাস

যে ছেলেটি একদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া ও অজীর্ণে ক্ষীণ হইয়া কোন রকমে প্রাণের প্রদীপটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল,

তাহারই অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের কথায় বিস্মিত হইতে হয়। তাহার মোটর-রোখা ঢাকা শহরকে প্রথম বিস্মিত করিয়া তোলে। বুক দিয়া ঠেলিয়া চলন্ত মোটর রোখা ইহার কৃতিত্ব। বছর কয়েকের নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চার ফলে অজীর্ণ রোগী অনুকূল আজ এমন শরীর-সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

শ্রীবনমালী ঘোষ ও তাহার ভাইসকল

বনমালী ঘোষ, গোবর বাবুর নাম-করা শিষ্য ও খ্যাতনামা পালোয়ান। ইনি গোবর বাবুর সঙ্গে আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং অনেকের সঙ্গে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কুস্তি লড়িয়াছেন। ইহার দুই ভাই—শ্রীহৃষী ঘোষ বি. এ. ও শ্রীপ্রকাশ ঘোষ বি. এস্-সি; ইহারাও ভাল কুস্তিগীর। হৃষী ঘোষ ভার-উত্তোলনে ১৯২৫ ও ২৭ সালে দুইবার All-Bengal Weight Lifting Cup লাভ করিয়াছিলেন।

বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতাস্থ আহিরীটোলায় বসন্তকুমারের পৈতৃক বাসভবন। মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়া মাত্র ২৩ বৎসর বয়সেই ইনি এত বিচিত্র রকমের নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন যাহা বস্তুতঃই গর্ব ও গৌরবের বিষয়। বাল্যকাল হইতেই বসন্তকুমার ব্যায়াম-চর্চায় অভ্যস্ত। দাঁতে ও হাতে শিকল ছেঁড়া, ৬।৭ মণ ওজনের কামানের গোলা শূন্যে

ছুঁড়িয়া তাহা ঘাড়ে ও পিঠে লওয়া, দাঁতদ্বারা টাট্টু তোলা ইত্যাদি শক্তিক্রীড়ায় বসন্তকুমার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বুকে হাতী তোলা ও গুরুভার প্রস্তর খণ্ড ধারণ করা (প্রায় ৫০ মণ) তাঁহার অন্যতম শক্তি-ক্রীড়া। চেয়ারে ঘাড় ও গোড়ালি রাখিয়া সমস্ত শরীর সাঁকোর মত করিয়া স্বর্গীয় শ্যামাকান্তের ন্যায় বুকে পাথর চাপা দিয়া 'হাতুরীর ঘা' মারা হইয়াছে, বসন্তকুমার ধৈর্য সহকারে সহ্য করিয়াছেন। একাধিক মোটর গাড়ী ও লরি (মালগাড়ী) একই দিকে ধাবমান হইলে টানিয়া রাখিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি কৌতুকপ্রদ রোমাঞ্চকর খেলা দেখাইয়াও বসন্তকুমার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। শায়িত অবস্থায় বসন্তকুমার ৭ হাত চওড়া ও ১৬ হাত লম্বা একখানি মই পায়ের উপর ধারণ করিতেন এবং উহার উপর ৮।১০ জন বালক উঠিয়া নানারূপ কসরৎ করিতে থাকিত। নাকের উপর একটি বাঁশ ধারণ করিয়া—উহার অগ্রভাগে পা-বাঁধা একটি বালক নানারকম কসরৎ দেখান। তীরের খেলা, বন্দুকের খেলা, ছোরার খেলা ইত্যাদিতেও বসন্তকুমার অভ্যস্ত হন।

শ্রীদিগেন্দ্র চন্দ্র দেব

ইহার বাড়ী মৈমনসিংহ জেলায়। মুক্তাগাছা হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মৈমনসিংহ কলেজে পড়েন। এক সময়ে মৈমনসিংহের বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর বাবু ধীরেন্দ্রমোহন সেনের নিকট ইনি বিশেষ ভাবে ব্যায়াম-চর্চা করেন। তিনি

অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু

মণি ধর— চুলের ও দাঁতের কসরতে অদ্বিতীয়

মণি দর—একদল ছেলেপিলে বোঝাই একটা গাড়ী চুলে বাঁধিয়া টানিয়া চলিয়াছেন
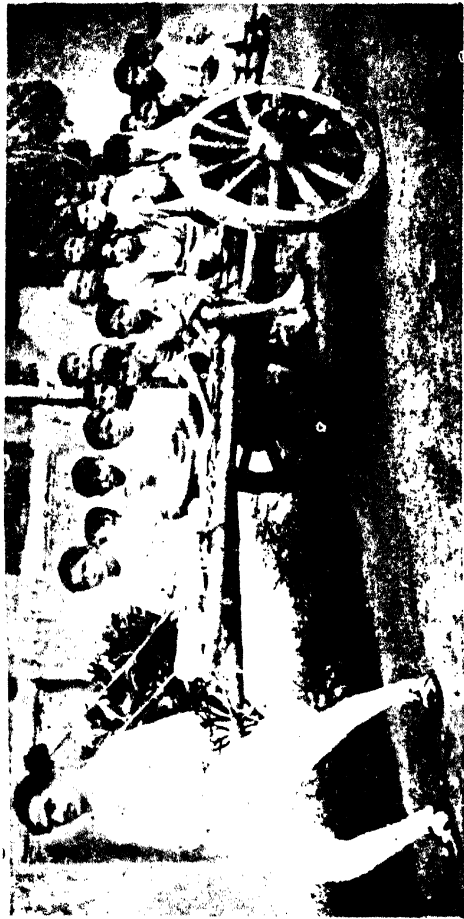
মণি ধর — দাঁতে আবদ্ধ রজ্জু সহায়ে একজন যুবক শূন্যে ঝুলিতেছে

গোবর বাবুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীবনমালী ঘোষ (মধ্যস্থলে উপবিষ্ট) ও ভ্রাতত্রয়

গাড়ীর গতিরোধ করিতে পারেন, বুকের উপর
। ধারণ করিতে পারেন, দেড় ইঞ্চি গোলাকার লৌহদণ্ড
রতে এবং এক হাতে দেড় মণ ভার উত্তোলন করিতে
রেন। এতদ্ব্যতীত লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, ধনুর্বিদ্যা, সড়কী
লা প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।
ত্তের হাত হইতে অসহায় রমণীদিগের উদ্ধার-কার্যে ইনি যথেষ্ট
তিত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হইয়া কলিকাতা হইতে আইন পাশ করিয়াছেন। ইনি শরীর-চর্চা
শিক্ষা দানে উৎসাহী। বর্তমানে ইনি ওকালতি করেন। ইঁহার
রীরের মাপ এইরূপ—উচ্চতা ৫´´—১১´´; বুক—৪৩´´; পুরোবাহু
Bicep)—১৭½´´; কটী—৩২´´; উরু—২৬´´; কব্জি—১৬½´´।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ (জন্ম ১৯০১ সেপ্টেম্বর)

সাঁতার কাটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। পূর্বে আমাদের দেশের প্রায় সকলেই ইহাতে অভ্যস্ত ছিল। পাড়া-গাঁয়ের জলাশয়গুলিকে সন্তরণ-প্রিয় ছেলেমেয়েদের দল আলোড়িত করিয়া তুলিত। শহরের আবেষ্টনে এই সহজ আনন্দটি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল। ইদানীং কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহরে এ বিষয়ে একটা সারা আনিয়াছে। আজ আমাদের পরম গৌরবের কথা, বাঙ্গালী যুবক প্রফুল্লকুমার দীর্ঘকাল সন্তরণে পৃথিবীর সকলের উপরে উঠিয়াছিলেন। প্রফুল্লকুমার ১৯৩০ সালের ৩০শে আগষ্ট শনিবার ভোর ৬টা ৮ মিনিটের সময় কলিকাতার কর্ণওয়ালীশ

ট্যাঙ্কে (হেঁটুয়া) সাঁতার কাটিতে নামেন। ক্রমাগত ৬৭ ১০ মিনিট সাঁতার কাটিয়া মঙ্গলবার ১টা ১৮ মিনিটের সময় হইতে উঠিয়া আসেন। তাহাকে কর্ণওয়ালীশ ট্যাঙ্ক ২৭৪ পারাপার হইতে হইয়াছিল।

শ্রীরবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এলাহাবাদের রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে আলীগড়ে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারী ও বহু বে-সরকারী ভদ্রলোকের সমক্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সময় সন্তরণ করিয়াছেন। ইহার পর, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। এলাহাবাদে ইংরেজী দৈনিক লীডারে এই ঘটনার যে বিস্তৃত বর্ণনা হইয়াছিল তাহা হইতে সংক্ষেপে দু-একটি কথা লিখিতেছি।—

"সেদিন সন্ধ্যায় অসম্ভব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। রবীন্দ্র চাটার্জিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট্, রবীনের মা ও ডাক্তার অগ্রবর্তী ছিলেন, তৎপর পুলিশ ব্যাণ্ডপার্টি, স্কাউট দল ও তাহাদের ব্যাণ্ডপার্টি ছিল। বহু লোক মিছিলে যোগদান করিয়াছিল। যখন সভাস্থলে মিছিল পৌঁছিল, তখন সেই দারুণ গরমেও প্রায় চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্র চাটার্জিকে সম্বর্ধনা করিলেন। এরূপ বিপুল উৎসাহ ও সম্মাননা খুব কম ব্যাপারেই দেখা যায়।"

ইহার পর রবীন চাটার্জি এলাহাবাদে ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিঃ সন্তরণে ছিলেন। ১৯৩৬ সালের ৬ জুলাই রাত্রি ১১-২০ মিনিটে লাহোর ডি.এ.ভি. কলেজের পুষ্করিণী হইতে ইনি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাঁতার হইতে উঠিয়া আসেন। ইনি ৬৩ ঘণ্টা এই ভাবে সাঁতারে ছিলেন।

শ্রীমণি ধর

চুলের ও দাঁতের কস্‌রতের জন্য মণি ধরের নাম বিখ্যাত। ইনি ঢাকানিবাসী ৺নগেন্দ্রচন্দ্র ধরের দ্বিতীয় পুত্র এবং কলিকাতার সুবিখ্যাত ধর ব্রাদার্সের অন্যতম মালিক। বাল্যকাল হইতে ইহার চুল অত্যন্ত ঘন ও কুঞ্চিত ছিল এবং চুলের বেশ যত্ন করিতেন। ১৯২৫ সাল হইতে ইনি পুলিন দাস মহাশয়ের লাঠি ক্লাবে নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। উহার বছর খানেক পরে একদিন চুলে বাঁধিয়া একটি বারবেল উত্তোলন করেন। ইহার পর হইতেই তিনি চুলের সাহায্যে নানা রকম কস্‌রত শুরু করেন। দাঁতের কসরতও ইহার পর হইতেই আরম্ভ করেন। চুলের সাহায্যে ইনি ৪০০ পাউণ্ড ওজনের বারবেল তুলিতে পারেন, মোটর টানিয়া রাখিতে পারেন, লোক-বোঝাই গরুর গাড়ী টানিয়া নিয়া যাইতে পারেন। দুই জন পূর্ণবয়স্ক যুবক তাঁহার চুল ধরিয়া দুই পাশে ঝুলিয়া থাকে এবং তিনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, দাঁতে দড়ি বাঁধিয়াও তিনি নিজে শূন্যে ঝুলিতে পারেন, এবং তাঁহার দাঁতে আবদ্ধ দড়ি সহায়ে একজন যুবক অনায়াসে ঝুলিয়া নানারূপ শারীরিক কস্‌রত দেখাইতে পারেন। দাঁত

ও চুলের ব্যায়াম ছাড়া ইনি লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতি খেলায়ও পারদর্শী। ইনি এ যাবৎ বহু স্থানে প্রকাশ্যে নিজের এই শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং কলিকাতার অনেকগুলি শরীর-চর্চা-সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস

ইনি স্বর্গীয় পুলিন বিহারী দাস মহাশয়ের ভাগিনেয়। কলিকাতায় মাতুলের নিকট নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চা শিক্ষালাভ করিয়া পারদর্শী হইয়াছেন। ইনি লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা ও যুযুৎসু বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইহার তলোয়ার খেলা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অনাবৃত উদরের উপর আলু পান ইত্যাদি তলোয়ার দ্বারা কাটা, জিহ্বার উপর চূণ ও লবঙ্গ রাখিয়া কাটা, নাকের উপরের সিঁদুর তুলিয়া লওয়া, মাথার উপর কলা রাখিয়া কাটা, ইত্যাদি তলোয়ারের খেলা বড়ই চমকপ্রদ। একটি আস্ত কলাগাছের মাথায় একটি নারিকেলসহ জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া গাছটিকে তলোয়ার দ্বারা এমন ভাবে টুকরা টুকরা করিয়া কাটেন যে সমগ্র গাছটি আস্তই স্থির ভাবে দাঁড়ানো থাকে এবং উহার মাথার কলসীও কিছুমাত্র টলেনা। শরীর-চর্চার নানা ক্রীড়া দেখাইয়া কুম্ভমেলায়, কংগ্রেসে, হিন্দুমহাসভায় ইনি বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হইয়াছেন। কলিকাতায় কয়েকটি শরীর-চর্চার প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া ইনি এই ব্যায়াম-চর্চার প্রচার কার্যে ব্যাপৃত থাকেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

ইনি ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ ও সাউথ সুবার্বান স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। ইনি বরিশাল কাশীপুরবাসী, বাল্যকাল হইতে ব্যায়াম-চর্চায় উৎসাহী ও মনোযোগী ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু নানাপ্রকার জিমনাষ্টিকে সুদক্ষ। অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ। তাঁহার বহু ছাত্র কৃতী ও বিখ্যাত। ইনি একাদিক্রমে বুকের উপর ৪ টন লোহার রোলার, লৌহ শিকল ছিন্ন করা ও লৌহদণ্ড বক্র করিতে পারেন।

শ্রীমণি রায়

ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক। ইনি নানা প্রকার জিমনাষ্টিকে সুদক্ষ এবং অনুপম শরীর গঠনের জন্য সর্বত্র প্রশংসিত।

মাষ্টার তহম্মল হোসেন

ইনি নবদ্বীপ এ্যাথলেটিক ক্লাবের সভ্য এবং ব্যায়াম-শিক্ষক। প্যারালেল বার, রিং, ট্র্যাপিজ, ফ্রী হ্যাণ্ড ড্রিল, ব্রতচারী নৃত্য, ছোরা খেলা, যুযুৎসু ও পেশী সঞ্চালনে পারদর্শী। ইনি তিন টন রোলার বোঝাই গাড়ী বুকে নেন, ধারাল পেরেকের উপর শুইয়া ৭।৮ জন লোক বুকের উপর নেন। ইনি রিপন কলেজে পড়িতেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের সভ্য। অনেক পুরস্কার পাইয়াছেন। দেহের গঠন সুন্দর।

শ্রীসুধীরকুমার দাস

ইনি নিখিল ভারত ভার-উত্তোলন প্রতিযোগিতায় ১১ ষ্টোন এর ভূতপূর্ব চ্যাম্পিয়ন। বাগবাজার জিমনাসিয়ামে ভার-উত্তোলন

মোটর সপিং ইত্যাদিতে সুদক্ষ। এক হাতে ১৩৫ পাউণ্ড ওজন তোলেন। ইনি বলরামবাবুর সাথে বরিশাল টাউন হল ও গৈলা, ঝালকাঠি, চাঁদপুর প্রভৃতি জায়গায় প্রদর্শনী দেখাইয়া সুনাম ও যশ অর্জ্জন করেন। ইহার দেহের ওজন ১৬৫ পাউণ্ড, উচ্চতা ৫ ফুঃ ২½ ইঃ, বাহু ১৪ ইঃ, বুকের বেড় (৪১½ ইঃ) সাধারণ অবস্থায়, ঘাড় ১৮ ইঃ, উরু ২২ ইঃ, কাপ ১৫ ইঃ, বর্তমান বয়স ২৪ বৎসর।

শ্রীমনোতোষ রায়

অপূর্ব সুন্দর শারীরিক গঠন ও পেশী সৌন্দর্যে খ্যাতিমান বিশ্বশ্রী (Mr. Universe) ব্যায়ামবীর শ্রীমনোতোষ রায়। ইহার বয়স বর্তমানে ২৮ বৎসর। ইহার বাড়ী নীলসলিলা বিশাল আয়তা মেঘনার তীরবর্তী গজারিয়া গ্রামে (ঢাকা জেলায়)। বাল্যকালে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া মনোতোষের জীবন শুরু হয় এবং মধ্য ইংরেজি স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই তাহার শরীর-চর্চারও আরম্ভ। সাধারণ জিনিস খাইয়া ইনি প্রথম জীবনে শরীর চর্চা করিয়াছেন। আত্মবিশ্বাস ও সংযত জীবন যাপন তাহার উচ্চাশার সহায়তা করিয়াছে।

ইনি শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য। ১৯৩৯ সালে মনোতোষ সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতায় নামেন, কিন্তু সফল হইতে পারিলেন না। ইহার পর বিষ্ণুবাবুর উৎসাহে আবার শরীর চর্চায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তাহার এই আন্তরিক চেষ্টা

আশাতীতরূপে সফল হইল। ইনি ইহার পর দেহ-প্রতিযোগিতায় অনেক বারই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

১৯৪৬ সালে অমরাবতীতে সর্বভারতীয় দেহ-প্রতিযোগিতায় ৫০০০ পাঁচ হাজার এ্যাথলেটদের মধ্যে পাঁচ দিনব্যাপী ডাক্তারি পরীক্ষার পর মনোতোষই প্রথম স্থান লাভ করেন। স্বর্গীয় দেশ-নায়ক শরৎচন্দ্র বসু ও শাহনওয়াজ এই কৃতিত্বের জন্য তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

১৯৫১ সালে মনোতোষ বিলাত যান। সেখানে দেহশ্রী প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। তাহার অনুপম মাইথলজিকাল পেশীভঙ্গিমা দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যান। তাহার প্রশংসায় চারিদিক্ মুখরিত হয় এবং তাহার স্বাক্ষর বা অটোগ্রাফের ভীড় আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। দর্শকগণ বলেন, এমন সুঠাম সৌন্দর্য আমরা আর কখনও দেখি নাই। এবারকার বিশ্বশ্রী মিঃ রায়ই এই অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বিলাতে ভারতীয় হাই কমিশনার ইণ্ডিয়া হাউসে তাহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাহার অত্যাশ্চর্য শারীরিক শক্তি ও ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় পাইয়া লোক মুগ্ধ হয়। বাস্তবিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের এরূপ সমাবেশ সত্যই বিরল। এই বছরই ব্যায়ামবীর শ্রীমনোহর আইচ দেহশ্রী প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে লণ্ডন যান এবং ক্ষুদ্রদেহীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

বর্তমানে ইনি বহু ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চা শিক্ষা দেন এবং অনেক পত্রিকায় নিয়মিত লিখেন। ব্যায়াম ও যোগব্যায়ামের

পুস্তকও ইনি লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া ব্যায়াম প্রচারের জন্য তাহাকে বহু স্থানে যাইতে হয়।

ইনি শারীরিক শক্তিচর্চায় যশস্বী হইলেও কবিতা, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায়ও ইহার দক্ষতা আছে।

আয়রনম্যান শ্রীনীলমণি দাশ

শ্রীনীলমণি দাশ ছেলেবেলায় রোগা ছিলেন, কেবল ফুটবল খেলিতে পারিতেন। ব্যায়াম করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ফুটবল খেলার জন্যে ব্যায়াম করিতে পারতেন না। একদিন ফুটবল ম্যাচ্ খেলার সময় বিপক্ষের খেলোয়াড় দর্শক দ্বারা প্রহৃত হইয়া ব্যায়াম আরম্ভ করেন। তাহার পিতা ব্যায়াম-পরিচালক শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস; প্রথম তাঁহার নিকট ব্যায়াম অভ্যাস করেন। পরে স্কুলের (কলিকাতা একাডেমী) ব্যায়াম-শিক্ষক বিখ্যাত জিম্‌নাষ্ট শ্রীসুবল বিশ্বাসের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করেন। কিছু দিন পরে বিখ্যাত ব্যায়ামাগার সিমলা ব্যায়াম সমিতির সভ্য হন। এই সমিতির ব্যায়াম-শিক্ষক ডাঃ নারায়ণ দাশের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করেন। বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন কালে মালদহে হিন্দুমহাসভার বাৎসরিক সম্মেলনে ইনি বিখ্যাত লাঠি-শিক্ষক স্বর্গীয় পুলিন বিহারী দাসের সহিত খেলা দেখান, তাঁর চমকপ্রদ শক্তির পরিচায়ক নানা ভাবে লৌহ বাঁকানোর খেলা দেখিয়া ঐ সম্মেলনের সভাপতি স্বর্গীয় বাসানন্দ গিরি মহারাজ ইহাকে 'আয়রনম্যান্' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন ও একটি পদক দেন। ইনি কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট,

অল্ বেঙ্গল ফিজিকাল কালচার এসোসিয়েশনের ব্যায়াম শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে ইনি বঙ্গবাসী কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক। ইনি ভারতীয় শরীর-চর্চা কংগ্রেসের সভাপতি, ব্যায়াম পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। বর্তমানে ইনি হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণার শতাধিক ব্যায়ামাগারের উপদেষ্টা ও পরিচালক।

নীলমণিবাবুর স্ত্রী এবং মেয়েও ব্যায়াম চর্চা করেন। তাঁহার মেয়ে শ্রীমতী গীতা দাশ নানারূপ আসনাদি অভ্যাসদ্বারা প্রশংসা লাভ করিয়াছে। নীলমণিবাবু বারবেল, প্যারালেল বার ও খালি হাতে ব্যায়াম সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তক লিখিয়াছেন।

শ্রীমনোহর আইচ

শ্রীমনোহর আইচ ১৯৫২ সালে লণ্ডনের বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রদেহীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি স্প্রীং পুলিং-এ বিশ্বরেকর্ড করিয়াছেন। ইহার বাড়ী ত্রিপুরা জেলায়। বাল্যকাল হইতে ইনি ব্যায়াম চর্চা করিয়া আসিতেছেন। ঢাকার জুবিলী স্কুলে পড়িবার সময় রূপলাল ব্যায়াম সমিতিতে ব্যায়াম করিতেন। গত মহাযুদ্ধে তিনি যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তিনি ব্যায়ামচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণকালী বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকালী বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বালিগঞ্জস্থিত [illegible] ব্যায়ামাগারের প্রধান ব্যায়াম-শিক্ষক। ইনি বর্ধমান-নিবাসী।

ইনি শক্তিশালী পুরুষ—হাতী বুকে নেওয়া, শিকল ছেঁড়া প্রভৃতিতে ইনি সুদক্ষ। ইনি দেশীয় ব্যায়ামের পক্ষপাতী। অবিবাহিত থাকিয়া বহু যুবককে ব্যায়াম-চর্চায় কৃতী করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ সুশিক্ষক এদেশে বিরল।

শ্রীপরিমল রায়

শ্রীপরিমল রায় আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এই কলেজ হইতে ইনি বি. এস্‌সি. পাশ করেন। বর্তমান বয়স ২৫ বৎসর। আশুতোষ কলেজে অধ্যয়ন করিবার কালেই ইনি শ্রীসরসীকুমার গাঙ্গুলীর নিকট ব্যায়াম শিক্ষা লাভ করেন। দেহশ্রী প্রতিযোগিতায় ইনি ১৯৫০ সালে 'হার্কিউলিস অব ইণ্ডিয়া', ১৯৫১ সালে 'বঙ্গশ্রী,' 'ভারতশ্রী' ও 'মিষ্টার এসিয়া' এবং ১৯৫২ সালে 'ভারতশ্রী' আখ্যা লাভ করেন। ইঁহার নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর। ইঁহার অনুপম দেহসৌষ্ঠব সত্যই আকর্ষণীয়।

শ্রীসরসীকুমার গাঙ্গুলী

সরসীবাবু আশুতোষ কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক। এই কলেজেই তিনি লেখাপড়া করেন এবং এখানকার ব্যায়ামাগারে তিনি ব্যায়ামচর্চা করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

সরসীবাবুর বাড়ী হাওড়া জেলার বালী গ্রামে। তাঁহার বাবা হাঁপানিতে মারা যান। সরসীবাবু পিতার কনিষ্ঠ ছেলে, স্বভাবতঃ রোগা। তাহার ওপর হাঁপানি রোগও তাঁহার কাঁধে চাপিয়াছিল।

কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ব্যায়ামী বলিয়া এই রোগকে তিনি পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন।

বাল্যকালে সরসীকুমার ভবানীপুর এল্-এম্-এস্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে পড়িতেন। এই সময় ফুটবল খেলায় তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। ১৯২৬ সালে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। ইহার পূর্বে ইনি এরাদৎ হোসেন নামক একজন বাঙালী মুসলমান পালোয়ানের নিকট তাহারই আখড়ায় কুস্তি শিখেন। আশুতোষ কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসের শিক্ষাধীনে ব্যায়ামচর্চা করেন। কলেজের পড়া ছাড়িয়া সরসীবাবু আশুতোষ কলেজের সহকারী ব্যায়াম-শিক্ষক হন এবং সুরেনবাবুর অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রধান ব্যায়াম-শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন।

সরসীবাবুর শক্তির খেলার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দাঁতের জোরে ভারোত্তোলন। এ বিষয়ে এদেশে আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি দাঁত দিয়া ৪৩৬ পাউণ্ড পর্যন্ত তুলিতে পারেন। ইহা ছাড়া হাতী বুকে লওয়া, বিপরীতগামী দুইটি মোটরের গতিরোধ করা, ঘুসি মারিয়া টালি ভাঙ্গা, ভারোত্তোলন ইত্যাদিতে তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

১৯৩২ সালে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার শরীর ও শক্তি গত ২০।২৫ বছর যাবৎ প্রায় একই অবস্থায় রাখিয়াছেন। তাঁহার দৈহিক মাপ এইরূপ (যখন বয়স ৪৫),—ওজন ১৪০ পাউণ্ড, দৈর্ঘ্য ৬৬", বুক ৪২" (৪৪½"), বাহু ১৩½" (১৬"), কটি ২৮"।

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য

প্রদ্যোৎবাবু অল-বেঙ্গল ফিজিকাল কালচার ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক। ইনি রাজেন্দ্র ঠাকুরতার ছাত্র। ইনি পূর্বে খুলনা ব্যায়াম সমিতি, খুলনা বি. কে. হাই স্কুল, দর্জিপাড়া ব্যায়াম সমিতি, বঙ্গীয় ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব ব্যায়াম-শিক্ষক। ইনি হাতদ্বারা ৩½" লোহার পাটি স্প্রিং করিতে, মুষ্ট্যাঘাতে এক সঙ্গে ১২ খানা টালি ভাঙ্গিতে, স্কন্ধের সাহায্যে লোহার কড়ি বাঁকাইতে এবং একযোগে তিনখানি মোটর গাড়ীর গতিরোধ করিতে সক্ষম ছিলেন। ভারতীয় কুস্তি ও যুযুৎসুতেও প্রদ্যোৎবাবু যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ফুটবল খেলাতেও ইনি এককালে নাম করিয়াছিলেন। ইহার উচ্চতা ৫' ১০", বুক ৪৩", বাহু ১৯", উরু ২৫"। ইনি যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার বড়গাতি গ্রামের অধিবাসী। ১৯১৬ সালে জন্ম হয়। বর্তমান বয়স ৩৮ বৎসর।

আয়রনম্যান্ শ্রীনীরদ সরকার

ইনি ঢাকা জিলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমায় জোকা-গ্রাম-নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত মঙ্গলচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বর্তমান বয়স ৪৩ বৎসর। শৈশবে নীরদবাবু অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন।

নীরদকুমার সর্বদা শ্রীকিশোরীমোহন সরকারের শরীর-চর্চা দেখিয়া ব্যায়াম অভ্যাস করেন।

কিছুদিন পর গ্রাম ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জ শহরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে আসিয়া ভর্তি হইয়া ব্যায়ামের একটু একটু সুযোগ পাইতে

আরম্ভ করেন এবং লাঠি, ছোরা, অসি, বর্শা, তীর, কুস্তি, যুযুৎসু, সাঁতারকাটা, রিং, প্যারালালবার প্রভৃতি অভ্যাস করিয়া এক বৎসরের মধ্যে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৯।১৯৩০ সালে পড়া ছাড়িয়া তিনি লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। জেল হইতে বাহির হইয়া তিনি কিছুদিন কলিকাতা থাকেন ও সেই সময় বাংলা মায়ের কৃতী বীর সন্তান ৺রাজেন্দ্রলাল গুহ ঠাকুরতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আন্দোলন থামিয়া গেলে তিনি দেশে আসিয়া গ্রামের কাছাকাছি বরঙ্গাইল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, এবং সেখানে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করিয়া বহু ছেলেকে লাঠি ছোরা প্রভৃতি শিক্ষা দিতে থাকেন। তখন হইতেই শরীর-চর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ও ছেলেদের ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করার পর তিনি ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হন, শরীর-চর্চার কৌশল দেখাইয়া তিনি উক্ত স্কুলে পর পর তিন বৎসর সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ সময় শরীর উল্টাইয়া ভার উত্তোলনে একটি ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেন। তারপর উক্ত বিদ্যালয়ের [illegible] ব্যায়াম-শিক্ষকের পদে চাকুরী করেন এবং তখনই নানা স্থানে শরীর-চর্চার প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য নানাপ্রকার পরিকল্পনা করিতে আরম্ভ করেন ও বহু স্থানে শরীরচর্চার কৌশল প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নীরদবাবুর অসীম শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া নীরদবাবুকে একটি স্বর্ণপদক ও লৌহমানব (আয়রনম্যান্)

উপাধি প্রদান করেন। তিনি মানিকগঞ্জ কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। তিনি বাংলা দেশের বহু গ্রামে ও শহরে অনেক শরীর-চর্চার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া বহু ছেলেকে স্বাস্থ্যবান করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন। কেবল যে শরীর-চর্চার কৌশল দেখাইতেই তিনি পারদর্শী তাহা নহে, অল্পদিনের মধ্যে অন্যের স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়া দিতেও তিনি পারদর্শী। তাহার শিক্ষা দিবার প্রণালী প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতির ব্যায়াম এবং দেশীয় সর্ববিধ ব্যায়াম ছাড়াও তিনি যোগব্যায়ামে বিশেষজ্ঞ। ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়াম দ্বারা তিনি বহু রুগ্ন ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধকে স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। প্রত্যেকে যাহাতে ঘরে বসিয়া ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম দ্বারা সুস্থ সবল হইতে পারে, এজন্য তিনি সহজ সরল ভাষায় 'শরীর ও শক্তি', 'সরল যোগব্যায়াম', 'নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন, 'যৌগিক পন্থায় রোগনিবারণ', 'মেয়েদের ব্যায়াম ও আসন' 'আসনের চার্ট' ও 'ব্যায়ামের চার্ট' প্রণয়ন করিয়া দেশের একটা মস্ত বড় অভাব পূরণ করিয়াছেন। তিনি বহু কৃতী ছাত্রও তৈয়ারী করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত খেলাগুলি তিনি দেখাইয়া থাকেন—ভার উত্তোলন; শরীর উল্টাইয়া ভার উত্তোলন (ইহা তাঁহার ভারতীয় রেকর্ড): হাতে তাস ছেঁড়া; শিকল ছেঁড়া; দাঁতে, হাতে লোহার পাত মোড়ান; লোহার বলের খেলা; দাঁত, কাঁধ, মস্তক, ঘাড়, গ্রীবাদ্বারা লোহার মোটা শিক বাঁকান; বোঝাই গরুর গাড়ী বুক, পেট ও

গলার উপর দিয়া চালান ; চুলে ওজন তোলা, মানুষ ঝোলান ও বোঝাই গরুর গাড়ী চালান ; মোটরের গতি রোধ ; ঘাড়ে বীম বাঁকান ; শুধু মাথা ও পা বেঞ্চে রাখিয়া পিঠের নীচে ফাঁক রাখিয়া বুকে ১৪।১৫ মণ পাথর চাপাইয়া দশ সের হাতুরী দিয়া ভাংগা ; রিং বারের খেলা ; লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু, অসি, বর্ষা, পেশী নৃত্য প্রভৃতি।

বর্তমানে ইনি শালকিয়া (হাওড়া) "সরকার ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম কলেজ" প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু ছেলেকে ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম শিক্ষা দিতেছেন। তাহা ছাড়া ইনি পশ্চিমবঙ্গে বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শিক্ষক। ২।৩ বৎসরের মধ্যেই তিনি পশ্চিমবংগে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। গত বৎসর কলম্বো বিশ্বপ্রদর্শনীতে তাঁহার যৌগিক ক্রিয়াদি দেখাইয়া বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

নীরদবাবুর ৫ বৎসর বয়স্ক কন্যা শ্রীমতী বকুল সরকার আসনাদি প্রক্রিয়া অতি চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছে এবং বহু স্থানে এই সকল ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার পাইয়াছে। ছোট ছোট মেয়েদের পক্ষে শ্রীমতী বকুলের দৃষ্টান্ত বিশেষ অনুকরণীয়।

শ্রীঅখিলকুমার দত্ত

আয়রনম্যান শ্রীনীরদকুমার সরকার মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে শ্রীঅখিল দত্ত অন্যতম। বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থা হইতে ইনি আয়রনম্যান শ্রীসরকারের নির্দ্দেশে ব্যায়াম করিয়া আজ একজন বিশিষ্ট ব্যায়াম-শিক্ষক ও সংগঠক। আয়রনম্যান

শ্রীসরকারের সংগে ইনি বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু স্থানে ব্যায়াম কৌশল দেখাইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্তমানে ইনি হাওড়া বেলিলিয়াস ইন্‌ষ্টিটিউটের ব্যায়াম-শিক্ষক। ইহা ছাড়াও বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিক্ষক। পূর্ব বংগে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমায় ইহার আদি বাসস্থান। বর্তমান বয়স ২৫ বৎসর।

শ্রীমণীন্দ্র সরকার

শৈশব হইতেই আয়রনম্যান শ্রীনীরদ সরকার মহাশয়ের নিকট ব্যায়াম করিয়া আজ মণীন্দ্র সরকার একজন কৃতী ব্যায়ামবীররূপে পরিগণিত। ইহার দৈহিক গঠন চমৎকার। বিভিন্নস্থানে ব্যায়াম-কৌশল দেখাইয়া প্রশংসা পাইয়াছেন। ইনি একজন যোগব্যায়াম-কুশলী। বি. এ. ক্লাশের ছাত্র। বর্তমান বয়স ২১ বৎসর। গত আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় ইনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে ইনি জাংগীপাড়া (হুগলী) ব্যায়ামাগারের শিক্ষক। ইহার আদি বাসস্থান ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমায়।